২০

বিদেশনীতির কৌশল
[Techniques of Foreign Policy]

(১) কূটনীতি

কূটনীতির সংজ্ঞা

বিদেশনীতি প্রস্তুতকালে নীতি-নির্ধারকগণকে বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হয় এবং সে-কারণে একটি বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে বিদেশনীতি প্রস্তুত করা হয় না। নীতি প্রস্তুতকারীরা একইসঙ্গে একাধিক কৌশল প্রয়োগ করেন। এখানে আমরা প্রথমে কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করব। বিদেশনীতি রচনার মধ্যে যতই দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতা থাক না কেন তাকে বাস্তবায়িত করাই হল আসল কাজ এবং এই কাজটি সম্পাদিত হয় মূলত দুটি উপায়ে যাদের মধ্যে একটি হল কূটনীতি এবং অন্যটি প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা। সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের জন্য আমরা প্রথমে অভিধান কী বলে তা দেখব। কূটনীতি হল একটি পেশা, ক্রিয়াকলাপ বা নৈপুণ্য যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়। অভিধান প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি সংক্ষিপ্ত হলেও অর্থবহ বলে আমরা মনে করি কারণ কূটনীতিকে একটি পেশা, ক্রিয়াকলাপ ও নৈপুণ্য হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে।

অভিধান-প্রদত্ত সংজ্ঞা ছাড়া আরও দু-একটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে বিদেশনীতি আছে বা রচনা করা হয় তাকে কার্যকর করে তোলার জন্য যে কৌশল বা হাতিয়ারটি সচরাচর প্রযুক্ত হয় তাকেই আমরা কূটনীতি বলতে পারি। এখানে কূটনীতিকে বিদেশনীতির একটি অস্ত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। সুতরাং কূটনীতি (diplomacy) ও বিদেশনীতি (কেউ কেউ এ দুটিকে সমার্থক বলে মনে করেন এবং এটা ঠিক নয়) পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ একের অনস্তিত্ব অন্যকে অর্থহীন করে তোলে।

অনেকে আবার কূটনীতিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার কাজে নিযুক্ত একপ্রকার দক্ষতা বলে মনে করেন। কারণ কোনো কাজ বা নীতির সম্যক পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে না। ঘটার কথাও নয়।

আর-একটি সংজ্ঞা হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানা ধরনের আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেই কাজ যে উপায়ে সম্পাদিত হয় তাকেই কূটনীতি বলা যেতে পারে।

স্যার আর্নেস্ট স্যাটো কূটনীতি সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন যে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার জন্য যে দক্ষতা, নিপুণতা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করা হয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তাকেই কূটনীতি বলা হয়। অর্থাৎ কূটনীতির মধ্যে একপ্রকার বিশেষ বুদ্ধির অস্তিত্ব বা প্রাধান্য আছে।

লার্কে ও সৈয়দ কূটনীতি ধারণাটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। কূটনীতি হল রাষ্ট্রের কাজ সম্পাদনের একটি কৌশল। আর এই কৌশল ব্যবহৃত হয় সরকারের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। (Diplomacy, considered as a technique of state action, is essentially a process whereby communications from one government go directly into the decision making apparatus of another). আমরা মনে করি লার্কে ও সৈয়দের সংজ্ঞাটি কূটনীতির প্রকৃতস্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হয়েছে। বাস্তবে আমরা কূটনীতির যে অস্তিত্বটি প্রত্যক্ষ করি লার্কে ও সৈয়দ তারই প্রেক্ষাপটে এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

ফ্র্যাঙ্কেল সোজাসাপটা ভাষায় বলেছেন যে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও কার্যকর করতে গিয়ে যে কৌশল প্রয়োগ করা তাকে কূটনীতি বলা যাবে।

হাস এবং হুইটিং (Haas and Whiting) অন্যভাবে ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন বলে আমরা মনে করি। তাঁদের মতে বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের ওপর রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চাপ সৃষ্টি করে যার উদ্দেশ্য হল পরস্পরের কাছে থেকে কিছু বাড়তি সুযোগসুবিধা আদায় করে নেওয়া। এই চাপ পরিচালনা করা ও স্বাভাবিক ধারায় প্রবাহিত হতে দিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখার নাম হল কূটনীতি। প্রতিটি রাষ্ট্র জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনে নিজ নিজ কর্মধারা নির্ধারণ করে এবং তা করতে গিয়ে রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি যাতে অচলাবস্থা ও তিক্ততা গড়ে না তোলে তার জন্যে যে কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয় তাকেই বলে কূটনীতি।

হার্টম্যান (Hartman) প্রদত্ত সংজ্ঞার উল্লেখ মনে হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ তিনি ভিন্নভাবে এটিকে দেখেছেন। কূটনীতিকে তিনি একপ্রকার বোঝাপড়া বলে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যেসমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয় অথবা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয় সেগুলির নিষ্পত্তির নিমিত্ত কূটনীতি সচরাচর বোঝাপড়ার আশ্রয় নেয়। কারণ প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ নিজ পথ ও কৌশল আঁকড়ে ধরে রাখলে তা শেষপর্যন্ত অচলাবস্থার সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই পরিস্থিতির উদ্ভব যাতে না হয় তার জন্যেই প্রয়োজন ঘটে বোঝাপড়ার এবং এই কাজটি কূটনীতি করে (The art of diplomacy is the art of compromise. To know how and when to compromise is the hallmark of the accomplished negotiator. Hartman : *Relations of Nations*, p. 92)।

পরিশেষে বলা যায় যে কূটনীতি হল বিদেশনীতি বাস্তবায়িত করার একটি উপায় মাত্র। কিন্তু তাই বলে সমগ্র নীতির এটি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য হতে পারে না। আইনসভা, সরকারি পর্যায় এবং অন্যান্য নানাভাবে কূটনীতি কাজ করে চলে। তবে কখন কোন্ উপায় বা মাধ্যম ব্যবহৃত হবে তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। ম্যাকলেলান (McLellan) এবং তাঁর সহলেখকগণ অন্তত তাই মনে করেন। তাঁদের মতে : Diplomacy is not the substance of policy, nor does it represent the process whereby governments formulate policy. It is but one of the ways in which policies are being implemented. It is practiced both in embassies and legations of one country located in another and in the conference halls.

পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, নানা বিষয়ে মতবিনিময়, নীতি নির্ধারণ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র যে কৌশল সচরাচর প্রয়োগ করে তাকেই কূটনীতি বলা যেতে পারে। এই কূটনীতির মধ্যে দূরদর্শিতা, বিজ্ঞতা এবং কুশলী পদক্ষেপ থাকে। কারণ এগুলির সাহায্যে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা রাষ্ট্র করে।

কূটনীতির জন্ম ও বিকাশ

পণ্ডিতব্যক্তিরা কূটনীতির জন্ম ও বিকাশ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন যে প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাকে কূটনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করা চলে। নগর-রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন ছিল এবং তারা স্বাধীনভাবে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি নির্ধারণ করত। ফলে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ও নানা বিষয়ে সংঘাত প্রায়ই দেখা দিত যার মীমাংসার জন্য ব্যবহৃত হত কূটনীতি। তবে প্রাচীন গ্রিসে কূটনীতি প্রধানত নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ বৃহত্তর দুনিয়ার নানা রাষ্ট্রের মধ্যে তখন রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও অন্যান্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। তাই ব্যাপকতার বিচারে কূটনীতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভে বঞ্চিত ছিল।

মধ্যযুগের ইউরোপে কূটনীতি কিছু পরিমাণে আপন স্থান দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিল বলে আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। নবজাগরণ (Renaissance) এ সংস্কার আন্দোলনের (Reformation Movement) পরবর্তী পর্যায়ে কূটনীতির পুনরুজ্জীবন দেখতে পাওয়া যায়। এই দুই ঘটনার পরে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ও ইউরোপের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের স্থাপন ঘটে। স্বাভাবিক কারণে কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনের ফলে নানা দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য নানাপ্রকার লেনদেন বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতায়াত অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। সম্পর্কের জগতে এই নতুন দিগন্তের সূত্রপাত কূটনীতির আবির্ভাব ঘটাতে সাহায্য করে। কূটনীতি ও বিদেশনীতি নতুন মাত্রা পায়।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের পরে কূটনীতি তার আপন স্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। ইউরোপে কয়েকটি রাষ্ট্র শক্তিশালী বা বৃহৎ রাষ্ট্রের শিরোপা পায় এবং এরা নিজেদের মধ্যে ধারাবাহিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে স্থায়ী কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ও সেই উদ্দেশ্যে স্থায়ী কূটনীতিবিদদের জন্য অফিস স্থাপিত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের বিদেশনীতির রূপায়ণের জন্য দরকার হয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির। অর্থাৎ কূটনীতি একটি পেশা ও কৌশল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরিচালনের জন্য দরকার হয় বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির (A recognised diplomatic profession developed characterised by the aristocracy of its members and secrecy of its methods.)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া এবং আফ্রিকার স্বাধীন দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কূটনীতির দেহে নতুন পাখনা সংযোজিত হল। কারণ অতীতে রাজনীতিক ও আর্থনীতিক সম্পর্ক মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নানা কারণে ইউরোপের দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ নেয় এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিও ইউরোপের নানা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন ও তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার দিকে আগ্রহ বাড়ছে। বর্তমানে এই কূটনীতির মাধ্যমেই বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত।

কূটনীতির বৈশিষ্ট্য

কূটনীতির বৈশিষ্ট্য এর সংজ্ঞাগুলির মধ্যেই নিহিত। পণ্ডিতগণ একে বিদেশনীতি পরিচালন ও রূপায়ণের একটি কৌশল বা হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন। কারণ বিদেশনীতি কার্যকর করতে হলে অন্যতম উপায় হল এই কূটনীতি। বিদেশমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নানা রাষ্ট্রে উপস্থিত হয়ে কূটনীতি বিষয়ক কাজকর্ম সশরীরে তদারকি করা অসম্ভব। তাই কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই দিক থেকে বিচার করে কূটনীতিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা খুবই ন্যায়সংগত।

কূটনীতিবিদ (diplomat) যখনই কোনো সমস্যার সমাধান বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অগ্রসর হন তখন সচরাচর তিনি গোঁড়ামি পরিত্যাগের চেষ্টা করে থাকেন এবং সেইসঙ্গে সমঝোতা বা বোঝাপড়ার ওপর জোর দেন যাতে বিরোধের মীমাংসা তাড়াতাড়ি হয় এবং কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। হ্যার্টম্যান এই সমঝোতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল হওয়ার দরুন কূটনীতিকে তার কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হয়। কারণ কূটনীতির লক্ষ্য হল যতদূর সম্ভব জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত করা এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে কূটনীতি অতীতের পথ থেকে সরে আসতে পারে। বিগত শতকের পাঁচের দশক থেকে সাতের দশকের একেবারে শুরু পর্যন্ত চিনের সঙ্গে আমেরিকার যে সম্পর্ক ছিল সাতের দশকের শুরু থেকে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অতীতে যে তিক্ততা ছিল তা অনেকখানি হ্রাস পায়। আবার নয়ের দশকে চিন বাজার-অর্থনীতি ও উদারীকরণ গ্রহণ করার ফলে নানা ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অতএব কূটনীতিকে একটি অপরিবর্তনশীল ধারণা বলে মনে করা ঠিক নয়। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে কূটনীতি বদলে যায়। আর সেটাই স্বাভাবিক।

কূটনীতিকে অনেকে একাধিক মডেল বা স্টাইলে (style) ভাগ করার কথা বলেছেন। একটি হল ইউরোপীয়ান স্টাইল বা মডেল এবং অন্যটি তৃতীয় বিশ্বের স্টাইল বা মডেল। ইউরোপীয় মডেল মূলত মনে করে যে কূটনীতি হল এক-প্রকার অস্ত্র বা হাতিয়ার যা প্রযুক্ত হয় বিদেশনীতিকে কার্যকর করে তোলার কাজে। এর অন্য কোনো তাৎপর্য আছে বলে ইউরোপীয় স্টাইল মনে করে না। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কূটনীতিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। তাদের মতে কূটনীতি হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ও আচার-আচরণ পরিচালনের একটি নীতিসম্মত উপায়। অর্থাৎ কূটনীতি অসৎ বা আগ্রাসী লক্ষ্যসাধনের উপায় বলে আদৌ গণ্য হতে পারে না।

আজকাল অনেকে কূটনীতিকে বহুপাক্ষিক (multilateral) প্রতিষ্ঠানীকৃত (institutionalised) ধারণা বলে মনে করতে শুরু করেছেন। ধারণাটি হল কয়েক দশক আগে পর্যন্ত কূটনীতি প্রধানত দ্বিপাক্ষিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ছিল। দুটি রাষ্ট্র নিজেদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য অথবা দুই দেশের অভিন্ন স্বার্থ-সমন্বিত বিষয়গুলি আলোচনার নিমিত্ত কূটনীতির আশ্রয় নিত। আজকাল রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন দেশের সমস্যার সমাধানের জন্য দৌত্যকর্ম সম্পাদন করে এবং রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে বহু ব্যক্তি দৌত্যকর্মে নিযুক্ত থাকেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিরা বিশেষ দেশের দূত হিসেবে কাজ করেন না। কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রসংঘ। তাই বলা হয়েছে এটি প্রতিষ্ঠানীকৃত।

কূটনীতির কাজ

কূটনীতি ও কূটনীতিবিদ—দুটি বিষয় বা ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা যদিও সচরাচর এই দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। কূটনীতি হল একটি কৌশল বা পদ্ধতি এবং কূটনীতিবিদ হলেন একজন ব্যক্তি যিনি সেই কৌশল বা পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। যা হোক, কূটনীতির কাজ বলতে বোঝায় বিদেশনীতি বাস্তবে প্রয়োগ যিনি করেন তাঁর কাজ। আপাতদৃষ্টে কূটনীতির কাজ বিদেশনীতি প্রয়োগ করা হলেও আরও অনেক আনুষঙ্গিক কাজ করতে হয় যেগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

(১) নিজের দেশের লোকেদের রক্ষা করা

কূটনীতিবিদের নিজের দেশের যেসমস্ত ব্যক্তি কূটনীতিবিদ যে যে রাষ্ট্রে আছেন সেই রাষ্ট্রে বসবাস করে অথবা বেড়াতে যায় এবং কোনো বিপদে পড়ে তখন কূটনীতিবিদের কাজ হল

নাগরিকদের রক্ষা করা (To protect the national of his country)। বিপদে পড়লে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া কূটনীতি বা কূটনীতিবিদের কাজ। প্রতিটি বৃহৎশক্তির অন্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাণিজ্য দূতাবাস (consulate) থাকে যারা নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। বাণিজ্য দূতাবাসগুলিকে কূটনীতিক উপকেন্দ্র বা diplomatic substations বলা হয়।

(২) রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা

কূটনীতিবিদ তাঁর নিজরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সেই রাষ্ট্রে উপস্থিত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ব্রিটেনস্থিত ভারতের কূটনীতিবিদ কূটনীতিসংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন তো করেন। উপরন্তু ব্রিটেনের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বা রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে যদি ভারতের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ওঠে ব্রিটেনস্থিত ভারতের কূটনীতিবিদ সেই কাজ করতে পারেন। ভারতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যদি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় সেই অনুষ্ঠানে ভারতের কূটনীতিবিদ ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুরূপভাবে এক দেশ অন্য দেশের পুনর্গঠন কাজে সাহায্য করলে সাহায্যকারী দেশের কূটনীতিবিদ সেখানে উপস্থিত থেকে উৎসাহ জোগানো। এইরকম নানাপ্রকার প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

(৩) তথ্য সংগ্রহ করা

বিদেশনীতি নির্মাণের জন্য বহুপ্রকার তথ্যের প্রয়োজন হয় এবং এগুলি প্রধান-একজন কূটনীতিবিদ নানারকম উৎস থেকে সংগ্রহ করেন (Because information and data are the raw materials of foreign policy, the gathering of information is the most important task of the diplomat aside from his/her bargaining activities. *Holsti*. p. 141)। ভারত আমেরিকা-সংক্রান্ত বিদেশনীতি নির্মাণ করতে চাইলে আমেরিকাস্থ ভারতের রাষ্ট্রদূত অবশ্যই সেই দেশের রাজনীতির হালহকিকত সম্বন্ধে নিখুঁত এবং সাম্প্রতিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে পাঠাবেন। এগুলি ব্যতিরেকে বিদেশদপ্তরের পক্ষে আমেরিকার ওপর বিদেশনীতি রচনা করা সম্ভব নয়। আমরা বিদেশনীতিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করি। কিন্তু একটি দেশ সব দেশের জন্য একই নীতি নির্মাণ করে না। প্রতিটি দেশের জন্য আলাদা আলাদা বিদেশনীতি থাকে এবং সেই কারণে প্রত্যেকটি দেশ থেকে স্বতন্ত্রভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়।

(৪) পরামর্শদান

কূটনীতির আর-একটি কাজ হল বিদেশদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিদেশনীতি রচনার কাজে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই কারণে যে বিদেশমন্ত্রকে যেসমস্ত কর্মচারী বা আমলা থাকেন তাঁদের বিশেষ দেশ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা নাও থাকতে পারে। অথচ এই অভিজ্ঞতা কূটনীতিবিদের থাকে। বিদেশনীতি প্রস্তুতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হলে কূটনীতিবিদের ডাক পড়ে এবং তিনি প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করে থাকেন। কূটনীতিবিদের পরামর্শ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিদেশনীতি নির্মাণ অনেকসময় বেশ কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

(৫) দরাদরি বা আলাপ-আলোচনা

অনেকের মতে এটি কূটনীতির একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বা স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হলে কূটনীতিবিদ সমস্যার সমাধানকল্পে দরাদরি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেন। কূটনীতির জন্মলগ্নে এই কাজটি ছিল এবং আজও আছে। এখানে কূটনীতিবিদের ভূমিকা হল আপসকারীর ভূমিকা। হার্টম্যান বলেছেন— Negotiation involves a delicate balance between giving what is asked and what is wanted. চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অনেকসময় বিস্তর ফারাক থেকেই যায়। উভয়ের মধ্যেকার এই ফারাককে কীভাবে কমিয়ে আনা যায় কূটনীতিবিদ সেই কাজ দক্ষতার সঙ্গে করে থাকেন। অভিজ্ঞ সেলসম্যানের মতো কূটনীতিবিদ আপসরফার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। যে দ্রব্য তিনি ফেরি করছেন তার গুণগত মান অন্যকে বোঝাবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। আবার যে বাজারে তিনি বেচতে গেছেন সেই বাজার সম্পর্কে তাঁর থাকে নিখুঁত জ্ঞান।

(৬) প্রতিবেদন প্রেরণ

যে দেশে কূটনীতিবিদ অবস্থান করেন সেই দেশ সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহের সাথে সাথে নানা বিষয় সম্পর্কে তিনি প্রতিবেদন পাঠান যার ওপর ভিত্তি করে বিদেশদপ্তর বিদেশনীতি প্রস্তুত করে। নানা দিক থেকে এই প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেদন বিদেশদপ্তরের কর্মচারীকে দেশ সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করে। প্রতিবেদনকে বিদেশনীতির কাঁচামাল বলে অভিহিত করা হয়। এর মধ্যে দেশের বস্তুগত অবস্থাই প্রতিফলিত হয় না, দেশের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়। পামার ও পারকিন্স সেই কারণে কূটনীতিবিদকে প্রথম শ্রেণির প্রতিবেদক বলেছেন। প্রতিবেদনের মধ্যে পরিস্থিতি ও ঘটনার উল্লেখ থাকলেও এদের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণও থাকে।

(৭) জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ

একটি দেশের বিদেশনীতির উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থকে সর্ববিধ উপায়ে সুরক্ষিত করা এবং এই কাজটি মূলত

সম্পাদিত হয় কূটনীতিবিদের দ্বারা। তিনি তাঁর বহুবিধ কাজের মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন। বিশেষ করে দরাদরি ও আলাপ-আলোচনার সময় তিনি লক্ষ রাখেন তার দেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে। জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা কেউ চায় না কারণ এর সংরক্ষণ করা হল জাতীয় সরকার এবং কূটনীতিবিদের অন্যতম কাজ। আর এক্ষেত্রে ব্যর্থতা সমগ্র সমাজে সংকট ডেকে আনবে। তাই তিনি জাতীয় স্বার্থের দিকে বিশেষ নজর দেন। তবে এ কাজটি তিনি একতরফাভাবে করতে পারেন না। অন্য দেশের স্বার্থের কথাও তাঁকে ভাবতে হয়।

(৮) কর্মসূচি পরিচালন

আজকাল বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে আদানপ্রদান পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি অতীতের তুলনায় অনেক গুণ বেড়ে গেছে। বহুজাতিক সংস্থা তৃতীয় বিশ্বের নানা জায়গায় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কাজে লিপ্ত এবং এর ফলে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। সম্পর্কের বৃদ্ধিসাধনের জন্য বহু রাষ্ট্র বিদেশে নানা কর্মসূচি নিচ্ছে। এগুলির সফল রূপায়ণ ও টার্গেট (target) এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার সে-কাজ কূটনীতিকে করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী বা সরকারি আমলা বিদেশে গিয়ে কর্মসূচির বাস্তবায়ন সম্ভব করে তুলতে পারেন না। বিদেশস্থ রাষ্ট্রদূত দেশের হয়ে কাজ করেন।

(৯) দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা

আন্তর্জাতিক সমাজে কমবেশি প্রায় সব রাষ্ট্রই নিজের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তুলতে বিশেষভাবে তৎপর। বিদেশের রাজধানীতে অবস্থিত কূটনীতিবিদরা ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। কী কী উপায় অবলম্বন করলে দেশের সম্মান ও ভাবমূর্তি বাড়বে তার উপায় উদ্ভাবন কূটনীতি করে থাকে। ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে বৃহৎশক্তি আজকাল উৎসাহী হয়ে উঠছে এবং সেই কারণে কূটনীতিবিদের কাজও বেড়েছে।

(১০) অন্যান্য কাজ

মর্গেনথাউ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একজন খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ। তিনি কূটনীতির কয়েকটি কাজের উল্লেখ করেছেন।

(ক) তাঁর মতে কূটনীতির প্রথম কাজ হল বাস্তবে কতটুকু ক্ষমতা পাওয়া যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে কতটুকু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তা খতিয়ে দেখা। ক্ষমতা বা সামর্থ্যের কথা না ভেবে কূটনীতিবিদ উদ্দেশ্য স্থির করলে তার বাস্তবায়ন সমস্যা দেখা দেবে। একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী কূটনীতিবিদ কেবল উদ্দেশ্য স্থির করে দায়িত্ব শেষ করবেন না, উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য যে উপাদান দরকার সেগুলিকে কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে সেদিকে নজর দেবেন। আর এ কাজ তিনি যদি করতে ব্যর্থ হন তাহলে উদ্দেশ্য কাগজে বন্দি অবস্থায় রাখার শামিল হবে।

(খ) একটি রাষ্ট্রের কূটনীতি অন্য রাষ্ট্রের কূটনীতির দ্বারা অনেক সময় প্রভাবিত হয়। সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ওপর সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োগ করা কূটনীতিবিদের কাজ। এই উদ্দেশ্যে এক রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদ অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনীতিবিদের কাজকর্ম বিশ্লেষণ করবেন।

(গ) বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিদেশনীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে হলে এদের মধ্যে একটি তুলনামূলক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে তুলনামূলক রাজনীতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় বিদেশনীতিসমূহের মধ্যে তুলনা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মনে করা হয় বিদেশনীতি সম্পর্কে একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পেতে হলে তুলনা করা দরকার। আর এই কাজটি কূটনীতিবিদকে করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় স্বার্থরক্ষা করতে অথবা সমস্যার মীমাংসা করতে হলে কূটনীতির সামনে একাধিক পথ খোলা থাকে এবং পথগুলির যে-কোনো একটিকে নির্বাচন করাই কাজ। এই পথগুলি হল সম্মতকরণ, ভীতি-প্রদর্শন ও আপসরফা। কোন্ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হবে তা কূটনীতি স্থির করবে। আর তা করতে গেলে কূটনীতিকে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অবশ্যই সক্রিয় বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

ওপরে আমরা কূটনীতির মোটামুটি মামুলি ধরনের কাজগুলির উল্লেখ করলাম। কিন্তু সমস্যা হল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল ও পরিবর্তনশীল। এই অবস্থায় একটি রাষ্ট্র বিশেষ ধরনের নীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রকে নতুন বিদেশনীতি রচনার কাজে হাত দিতে হবে এবং সেই কাজটি করবে কূটনীতি। সেই প্রয়োজনে কূটনীতি বিদেশনীতির জন্য নতুন নতুন নীতি উদ্ভাবন করবে। সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন পথের সন্ধান কূটনীতি দেবে। আর এইসমস্ত কাজ করতে হলে কূটনীতিবিদ তার নিজের জ্ঞানভাণ্ডার নতুন নতুন তথ্য ও ঘটনার দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

জ্ঞানার্জন ও কর্তব্য সম্পাদন কোনো কাজেই তিনি সংকীর্ণতা এবং গোঁড়ামির আশ্রয় নেবেন না। হোলস্টি বলেছেন (পৃ. ১৪৪)—Diplomacy is concerned ultimately not only with persuasion, but with correcting and systematising new knowledge enunciating general principles and educating those who do not have all the relevant knowledge surrounding a problem.

কূটনীতি ও বিদেশনীতি

বিদেশনীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তব রূপায়ণে কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যে আছে তা দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে। বিজ্ঞান ও কারিগরি কৃৎকৌশলের উন্নতি এবং মতাদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রভাব কূটনীতিবিদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে দিয়েছে বলে অনেক সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করলেও বিদেশনীতির আঙিনা থেকে কূটনীতি এখনও পর্যন্ত অপসারিত হয়নি। আন্তর্জাতিক সমাজে কূটনীতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চলমান প্রক্রিয়া। আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিচালন ব্যবস্থায় কূটনীতিকে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। কূটনীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে বলে যতই ক্ষেদোক্তি করা হোক না কেন বিদেশনীতি ও কূটনীতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বৈদেশিক সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু হল কূটনীতি। বিদেশনীতির সংক্ষিপ্ততম রূপ আমরা দেখি : It is the substance of foreign relations. অন্যদিকে,—diplomacy, proper, is the process by which policy is carried out. বিদেশনীতি স্থিরীকরণে নানারকম প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বিদেশমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ও জনমত এমনকি প্রেস-প্রভাবী গোষ্ঠীকেও বিদেশনীতি নির্ধারণে সক্রিয় হতে দেখা যায় যদিও তা পরোক্ষে। কিন্তু নির্ধারিত নীতিকে কার্যকর করার জন্য অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তি অপরিহার্য। এই পরিসেবা আসে কূটনীতিবিদের কাছ থেকে। সুতরাং নীতি নির্ধারণ ও নীতির বাস্তবায়ন দুইই কূটনীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। স্বাভাবিকভাবে বিদেশনীতি পর্যালোচনাকালে কূটনীতির কথা এসেই যায়। পামার ও পারকিন্স যথার্থই বলেছেন : Diplomacy provides the machinery and the personnel by which foreign policy is executed, one is substance; the other is method.

প্রতিটি রাষ্ট্র সচরাচর জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে বিদেশনীতির কাঠামো প্রস্তুত করে। ভাববাদীরা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন রাষ্ট্র মতাদর্শকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে বিদেশনীতি স্থির করে না। যা হোক, বিদেশনীতিকে একটি লক্ষ্য বলে বিবেচনা করা হয় এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার পথ অনেক। কূটনীতি হল সেইসমস্ত পথের একটি, তবে গুরুত্বের বিচারে কূটনীতি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবি করতে পারে। কূটনীতি নামক হাতিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করে। মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনা এবং ভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে সাযুজ্যবিধান কূটনীতির অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। কূটনীতি নামক হাতিয়ার ছাড়া এ কাজগুলি অন্য কারুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুদূর অতীতেও কূটনীতি এই কাজ করত, আজও করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওলট-পালট পরিবর্তন না হলে এ কাজ অবিকৃত অবস্থায় থাকবে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত *The Congress of Vienna* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নিকলসন বলেছেন যে শান্তির সময় কূটনীতি নানাবিধ পথ অবলম্বনপূর্বক উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত থাকে। কেবল সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে কূটনীতি সমস্যা সমাধানে রত থাকে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কূটনীতি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। যুদ্ধের সময় কূটনীতি সহযোগিতা করে না। নিকলসনের এই মন্তব্য অনেকে মেনে নিতে পারেননি। পামার ও পারকিন্স বলেছেন : It is misleading to suggest that diplomacy ceases to function when major international crises arise, especially if they lead to war. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রতিটি দেশের বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য। সুতরাং যুদ্ধের সময় জাতীয় নিরাপত্তা যদি সংকটাপন্ন হয় তাহলে কূটনীতিবিদ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে অথবা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে কূটনীতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে কূটনীতির ভূমিকা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শান্তি ও যুদ্ধের সময় কূটনীতির ভূমিকা কখনও এক থাকে না। শান্তির সময় কূটনীতিবিদের তৎপরতা বা উদ্‌বেগ থাকে না বা থাকলেও তা নগণ্য। কিন্তু যুদ্ধের সময় কূটনীতিবিদকে বিশেষভাবে তৎপর হতে হয়। একটি রাষ্ট্রের সম্মান, নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ একজন কূটনীতিবিদের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। একইসঙ্গে বিদেশমন্ত্রীদের কাজও বহুলাংশে বেড়ে যায়। এ কথা মনে করা ভুল যে বিদেশনীতির সংকট মোকাবিলা করার সাধ্য কূটনীতির নেই। বরং বলা যেতে পারে কূটনীতির সাফল্যের মাপকাঠি হল বিদেশনীতির সংকট যথাসাধ্য দ্রুততার সঙ্গে মোকাবিলা করা। দুই বিশ্বযুদ্ধের দিকে তাকালে এই মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। ইতিহাসে এমন নজির লিপিবদ্ধ করা নেই যে যুদ্ধের সময় কূটনীতিকে স্থগিত রাখা বা কূটনীতিবিদের কার্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিদেশনীতির বাস্তব রূপায়ণে কূটনীতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করলেও দুয়ের মধ্যে পার্থক্য যে আছে তা উপেক্ষা করা চলে না। পণ্ডিতব্যক্তিরা বলেন যে বিদেশনীতি স্থিরীকরণে কূটনীতি সরাসরি জড়িত থাকে না। রাষ্ট্রের একটি করে সু-সংগঠিত ও অভিজ্ঞব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বিদেশমন্ত্রক থাকে। বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা নিজেদের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা এবং তথ্যাদির সাহায্যে নীতি স্থির করেন। কূটনীতির কাজ তাকে কার্যকর করে তোলা।

বিদেশদপ্তরের অধীনে থেকে কূটনীতি কাজ করে। কিন্তু বিদেশদপ্তর যদি বিদেশমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী অথবা স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে কূটনীতিবিদ নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারেন না। বিদেশমন্ত্রকের নির্দেশেই তাঁকে চলতে হয়। **বিদেশনীতিতে কূটনীতিবিদের ভূমিকা মুখ্য নয়।** এজন্য দেখা যায় যে কূটনীতি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকতে পারে। অথবা কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে কূটনীতিক কার্যাবলিও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিদেশমন্ত্রকের কাজকর্ম সচরাচর বন্ধ হয়ে যায় না।

পক্ষান্তরে, বিদেশনীতির রূপরেখা নির্মাণে এবং বাস্তবায়নে বিদেশমন্ত্রকের যতই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাক না কেন কূটনীতির ভূমিকাকে আদৌ অবমূল্যায়িত করা ঠিক নয়। কারণ বিদেশমন্ত্রকের অভিজ্ঞ কর্মচারীরা যখন নীতি স্থির করেন তার মালমশলা আসে কূটনীতিবিদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে। বিদেশের রাজধানীতে অবস্থানকালে সেই দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সংগৃহীত সর্বাধুনিক তথ্যাদি কূটনীতিবিদ নিজ দেশের রাজধানীতে প্রেরণ করেন। অভিজ্ঞতা ও তথ্যাদির হস্তান্তর বিদেশনীতি স্থিরীকরণের প্রাথমিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। কূটনীতিবিদের ভুল, বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য ও অপরিণত বুদ্ধিজাত অভিজ্ঞতা কখনও বলিষ্ঠ নীতির উপাদান হতে পারে না।

বিদেশমন্ত্রকের সচিব যে নীতি স্থির করে দেন তার হুবহু বাস্তবপ্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। কিছু রদবদল অবশ্যই করতে হয় এবং এই কাজ সম্পাদিত হয় কূটনীতিবিদের দ্বারা। সুতরাং **কূটনীতিবিদকে বিদেশনীতির একজন যান্ত্রিক রূপকার বলে মনে করলে ভুল হবে।** তিনি যন্ত্রের মতো কাজ করলেও কখনও যন্ত্র নন। বাস্তব পরিস্থিতি, রাজনীতিক আবহাওয়া ও অপরাপর আনুষঙ্গিক উপাদান ও পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক নীতিকে বাস্তবে পরিণত করে থকেন। বিদেশনীতিকে ফলপ্রসূ করার কাজে কূটনীতির ভূমিকাই সর্বাধিক। আবার কূটনীতি কার্যকর হয়ে উঠবে যদি বিদেশদপ্তর সঠিকভাবে পরিচালিত হয়। এই পরস্পর নির্ভরশীলতাকে অস্বীকার করলে কূটনীতি বা বিদেশনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা যাবে না। বলা যেতে পারে যে কূটনীতি ও বিদেশদপ্তর পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। কেউ কারুর প্রতিযোগী হয়।

নয়া কূটনীতি

অষ্টাদশ শতকে মহাপরাক্রমশালী সম্রাট বা রাষ্ট্রের নিয়ামকগণ সামরিক শক্তির সাহায্যে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করতেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণির রাষ্ট্রনায়কদের কাছে জাতীয় স্বার্থ ছিল বিদেশনীতির একমাত্র চালিকাশক্তি তাঁদের আচরণ অন্য রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনার মধ্যে আনতে চাইতেন না। অর্থাৎ কূটনীতি বলতে বোঝাত রাজা বা সম্রাটগণের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা। প্রাশিয়ার পিটার দ্য গ্রেট বা ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট নিজেদের পছন্দমতো কূটনীতি পরিচালিত এবং বিদেশনীতির রূপরেখা তৈরি করতেন। এমনকি লক্ষ্যসাধনের নিমিত্ত পীড়নমূলক উপায় প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না। **কূটনীতি সম্পূর্ণরূপে গোপন এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কারণে সংসদ ও জনমতের প্রভাব ছিল না।**

শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লব ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতির চালচিত্র বদলে দেয়। রাষ্ট্রশাসকগণ খামখেয়ালি বা পছন্দ ও অপছন্দকে বাদ দিয়ে জনমতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে আরম্ভ করেন। যার ফলে কূটনীতি কতকগুলি নিয়ম-প্রনিয়মের দ্বারা পরিচালিত হতে আরম্ভ করে। তবে পেশাদার কূটনীতিবিদ বিদেশনীতির মুখ্য নিয়ামকের আসনে বসতে পারেননি। অভিজাত সম্প্রদায় এবং এলিট গোষ্ঠীর লোকেরা কূটনীতি পরিচালন কাজে অগ্রণী ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। তারপর এল ভিয়েনা কংগ্রেস। কূটনীতি নামক বিরাট এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ারটিকে আনুষ্ঠানিকতা, নিয়মকানুনের কঠোরতা এবং শৃঙ্খলার ওপর স্থাপন করার কাজে ভিয়েনা কংগ্রেস উদ্যোগী হয়। কূটনীতির শ্রেণিবিভাগ এবং কূটনীতিবিদদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিয়মকানুন তৈরি হল এই ভিয়েনা কংগ্রেসে। **এই ভিয়েনা কংগ্রেসের পর থেকে কূটনীতি একটি প্রথাগত, বৈধ এবং সর্বজনগ্রাহ্য চেহারা গ্রহণ করে। মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধান কূটনীতির একটি অংশ হয়ে থাকলেও কূটনীতিক ক্রিয়াকলাপ পেশাদার ও অভিজ্ঞ আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হতে আরম্ভ করে। নয়া কূটনীতির যাত্রা এখান থেকেই।**

উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের গোড়া থেকে নয়া কূটনীতি (New Diplomacy) যাত্রা শুরু করে। তবে এর আবির্ভাবের পেছনে একাধিক কারণ অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। প্রথমত, পৃথিবীর বিভিন্

রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ায় রাষ্ট্রগুলি কূটনীতিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিচার করতে আরম্ভ করে। অতীতে যেসমস্ত রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে আদৌ আগ্রহী ছিল না, মিথস্ক্রিয়া বেড়ে যাওয়ার পরে তারা নিজেদের মধ্যে কূটনীতিবিদের বিনিময় ও নানারিধ বিষয়ে আদানপ্রদানের ওপর জোর দেয় যার ফলে কূটনীতিক ক্রিয়াকলাপ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। বিশ শতকের গোড়ায় আন্তর্জাতিক সমাজ মোটামুটি একটি চেহারায় এসে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রত্যেক রাষ্ট্র আনুগত্য দেখাতে শুরু করে। আর্ন্তজাতিক সমাজ সার্বভৌম এককগুলি নিয়ে গঠিত হলেও এবং নিজেরা প্রায়ই সংঘাতে লিপ্ত হলেও সহযোগিতা ও আদানপ্রদানের ওপর রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কূটনীতি অতীতের আচরণ পরিত্যাগ করে নতুন সাজে সজ্জিত হয়। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি প্রধানত পরিচালিত হতে থাকে কূটনীতিবিদগণের দ্বারা।

নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের পেছনে অন্য যে একটি উপাদান কাজ করেছিল তা হল বিশ্বজনমতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। অতীতে রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশমন্ত্রীরা আইনসভা ও জনমতকে অন্ধকারে রেখে ইচ্ছামতো চুক্তি সম্পাদন করতেন। অথচ চুক্তির ফলাফল জনগণকে ভোগ করতে হত। বিশ শতকের শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী হতে শুরু করে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারি সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে। বহুক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল জনমত উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর বিষয়ে পরিণত হয়। বিশেষ করে উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলিতে জনমত, প্রেষ-প্রভাবী গোষ্ঠী ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সরকারের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখায় গোপনে চুক্তি সম্পাদনের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের গোপন কূটনীতি এবং বিশ শতকের জাগ্রত জনমত ও গণতন্ত্রের অগ্রগমন উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। স্বার্থান্বেষী মহলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গোপন কূটনীতিকে দীর্ঘকাল ধরে লালিত স্থান নয়া কূটনীতিকে ছেড়ে দিতে হল। ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রেষ-প্রভাবী ও স্বার্থবাহী গোষ্ঠীগুলি এবং রাজনীতিকদল বিদেশনীতির কোনো কোনো অংশ গ্রহণ ও বর্জনের জন্য চাপ দিতে থকে এবং ক্ষমতাসীন দল পরবর্তী নির্বাচনের কথা ভেবে এইসমস্ত দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। মার্কিন ও ব্রিটিশ রাজনীতি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় গোপন কূটনীতিরও অবসান হয়। পণ্ডিত ও অভিজ্ঞব্যক্তিরা বলেন যে মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনের এমন কোনো বিভাগ নেই যার ওপর প্রেষ-প্রভাবী বা স্বার্থবাহী গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েনি। কূটনীতির ওপর গোপনীয়তার যে বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তার অবসান ঘটে।

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগবিজ্ঞানের গগনচুম্বী সাফল্য কূটনীতির শরীরে একটি নয়া আচ্ছাদন চাপিয়ে দিয়েছে, আর একে আমরা বলছি নয়া কূটনীতি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে হ্যারল্ড নিকলসন-এর "ডিপ্লোমেসি" নামে একটি বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয় যাতে তিনি নয়া কূটনীতিকে কেবল স্বাগত জানাননি, এর আগমনের কারণগুলিও উল্লেখ করেন। নিকলসন-এর মতে অন্যতম কারণ হল যোগাযোগবিজ্ঞানের অগ্রগতি। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে যোগাযোগ ও প্রযুক্তিবিদ্যা যে অবস্থায় ছিল একুশ শতকের শুরুতে তা বহুগুণ সমৃদ্ধিশালী হয়েছে যার ফলে কূটনীতিও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আধুনিক হয়ে উঠেছে। হয়তো যোগাযোগবিজ্ঞানের অগ্রগতি পারম্পরীয় কূটনীতির গুরুত্ব কিছু পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কূটনীতি বা কূটনীতিবিদ্যার অবসান হয়নি, নতুন রূপে এটি আবির্ভূত হচ্ছে। অর্থাৎ কূটনীতি আছে। কিন্তু তার লক্ষ্য, কাজ ও আচরণ বদলে যাচ্ছে। মতবিনিময়, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতির ওপর যোগোযোগবিজ্ঞান প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে। বস্তুত, অতীতের আলাপ-আলোচনার যে স্বরূপ ছিল আজ আর তা নেই। পৃথিবীর শিখরস্থানীয় রাজনীতিবিদরা স্ব স্ব স্থানে বসে নিজেদের মধ্যে অতি সহজে মতবিনিময় করতে এবং গতানুগতিক কূটনীতিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করতে পারেন। লক্ষ করার বিষয় হল বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছেন। বর্তমান যুগ হল বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগ। রাষ্ট্রনেতারা কীভাবে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণ প্রচার-মাধ্যমগুলির সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে তা জানতে পাচ্ছে এবং নেতারা জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের যুগে গোপনে কোনোকিছু করার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে গিয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের আবির্ভাব নয়া কূটনীতিকে আরও আকর্ষণীয় এবং গ্রহণযোগ্য করেছে। রাষ্ট্রসংঘ সনদের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে এই সংগঠনটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতার সাহায্যে বিরোধ মীমাংসার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ করে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংঘাত নিষ্পত্তির যেসমস্ত পদ্ধতির উল্লেখ আছে সেগুলি তো নয়া কূটনীতির কৌশল। আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, সালিশি প্রভৃতি পরম্পরাগত কূটনীতিক কৌশল। তবে অতীতে কূটনীতিবিদগণ গোপনে এইসমস্ত উপায়ের সাহায্যে সমস্যার মীমাংসা বা চুক্তি সম্পাদন

করতেন। রাষ্ট্রসংঘ সেখানে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে সক্রিয়তা প্রদর্শন করছে। আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রসংঘের আবির্ভাব পরম্পরাগত কূটনীতির ওপর একটি বড়োমাপের আঘাত হেনেছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে বর্তমানে সোর্ক, জোট, আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠেছে এবং এগুলির গুরুত্ব দিনের পর দিন বাড়ছে। এরা অতীতের কূটনীতিবিদদের বহু প্রকার কাজকর্মের কিছু কিছু সম্পাদন করছে। যেসমস্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে আঞ্চলিক সংগঠন গঠিত হয়েছে তাদের রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশমন্ত্রীরা প্রায়ই মিলিত হচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার আলোচনা ও মীমাংসার জন্য। সহযোগিতার বা সমঝোতার ক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রনায়করা চিহ্নিত করছেন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে যত বিরোধ থাক না কেন সার্ক-এর সম্মেলন মোটামুটি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোতে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বিষয়টি আলোচনার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ মিলিত হন। এই সম্মেলনে কূটনীতিবিদদের ভূমিকা ছিল যৎসামান্য। ৭০/৭৫ বছর আগে হয়তো এই জাতীয় সম্মেলন হত কি না সন্দেহ এবং হলেও এতগুলি নেতাকে এক জায়গায় দেখা যেত না। কেবল কায়রো সম্মেলন নয় আজকাল এই জাতীয় অনেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রকাশ্য বনাম গোপন কূটনীতি

নয়া কূটনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রকাশ্য কূটনীতি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে অতীতে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ গোপনে নানাপ্রকার চুক্তি সম্পাদন করতেন বা সিদ্ধান্ত নিতেন যেগুলির অনেক জনগণের সার্বিক কল্যাণ-সাধনের পরিপন্থী ছিল। অথবা অন্য রাষ্ট্রের বৈষয়িক ক্ষতিসাধন করাই ছিল এইসমস্ত চুক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। এইসমস্ত চুক্তির ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পেত। নয়া কূটনীতি গোপন কূটনীতির ওপর আঘাত হানে। বিশ শতকের গোড়ার প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি কংগ্রেসে যে বাণী উইলসন পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যেই তিনি চৌদ্দ দফা কর্মসূচির কথা বলেন। এই কর্মসূচির একটি হল প্রকাশ্য কূটনীতি। উইলসন বলেছিলেন : Open covenants of peace openly arrived at, after which there shall be no private international understanding of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view. অর্থাৎ প্রকাশ্য চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর গোপনে বোঝাপড়া বা আলাপ-আলোচনা হবে না। প্রকাশ্য চুক্তির যাবতীয় আলোচনা প্রকাশ্যেই সম্পাদিত হবে। রাষ্ট্র গোপনে কিছু করতে পারবে না।

উইলসনের এই ঘোষণা ঐতিহাসিক। তাঁর এই যুগান্তকারী ঘোষণার পর থেকে কূটনীতিকে গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে প্রকাশ্য স্থানে উপস্থাপিত করা হয়। প্রশ্ন হতে পারে কেন উইলসন গোপন কূটনীতির ওপর এমন তীব্র আঘাত হানলেন? বিশ্বের ইতিহাস ও শাসকগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম শত্রু ছিল গোপনে চুক্তি করা ও বোঝা-পড়ায় আসা। বৃহৎশক্তিবর্গের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই এই পথ অবলম্বন করতেন যার ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংকটের মুখে উপস্থিত হত। আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনা ছিল একটি অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়াকে রাষ্ট্র অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় বলে মনে করত না। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অসংখ্য গোপন চুক্তি বা বোঝাপড়া বিশ্বের রাজনীতিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তাই লিগের চুক্তিপত্রে প্রকাশ্য কূটনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লিগের সময় থেকেই প্রকাশ্য কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মর্যাদা পায়। প্রকাশ্য কূটনীতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা একে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে এনে হাজির করবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘ সনদের নানা অনুচ্ছেদে প্রকাশ্য কূটনীতির পক্ষে জোর সাফাই গাওয়া হয়। বিশ্বের বহু শান্তিকামী রাষ্ট্র ও শীর্ষস্থানীয় নেতা প্রকাশ্যে কূটনীতির পক্ষে তাঁদের মন্তব্য ব্যক্ত করেন। তাঁরা বলেন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে এটি অপরিহার্য। এমনকি কোনো কোনো রাষ্ট্র গোপনে কূটনীতিক কাজকর্ম চালালেও প্রকাশ্যে তারা প্রকাশ্য কূটনীতির পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। মোটকথা, প্রকাশ্য কূটনীতির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সকলেই অবহিত ছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে আমরা এই প্রকাশ্য কূটনীতির একজন অন্যতম প্রবক্তা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মহাসচিব নিজে কূটনীতিবিদের ভূমিকা পালন করেন বা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অথবা প্রকাশ্য কূটনীতি বিষয়ক কাজকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি তাঁর আস্থাভাজন ব্যক্তিবর্গের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব বুত্রোস-বুত্রোস-ঘালি ভারত সফরে এসে বলেছিলেন যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসার জন্য তিনি মধ্যস্থতা করতে রাজি। অবশ্য উভয়রাষ্ট্রকে তাঁর মধ্যস্থতার প্রতি অনুমোদন জানাতে হবে। কেবল বুত্রোস-বুত্রোস-ঘালি নন, অতীতের একাধিক মহাসচিব কূটনীতিবিদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখনও মহাসচিব এই প্রকাশ্য কূটনীতির দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ২০০৮ খ্রি.-এর ৪ নভেম্বর বারাক ওবামা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন যে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের

জন্য তিনি প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাঠাতে ইচ্ছুক। অবশ্য উভয় রাষ্ট্র যদি রাজি থাকে।

সমালোচনা

বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশ্য কূটনীতির প্রতি স্বাগত জানানো হলেও বিশেষজ্ঞমহল একে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। অভিজ্ঞব্যক্তিরা বলেন যে কূটনীতি যদি গোপন না থাকে তাহলে তাকে কূটনীতি বলা যাবে না। কারণ গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে গেলে কূটনীতির আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। হ্যারল্ড নিকলসন হলেন আধুনিক কূটনীতির একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা। তিনি বলেন : In practice, it is a most-irksome obligation. কূটনীতিকে যদি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে হাজির করা যায় তাহলে কূটনীতিবিদরা এর সাফল্যের চেয়ে জনগণকে সন্তুষ্ট করার দিকে অধিক নজর দেবেন। কারণ জনগণ অখুশি হলে নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই তারা জনগণের দিকে তাকিয়ে আলাপ-আলোচনা চালান। জাতীয় স্বার্থ বা কূটনীতিক সাফল্যকে তাঁরা গৌণ করে দেখেন।

নিকলসন আরও বলেছেন যে প্রকাশ্য কূটনীতির বড়ো ত্রুটি হল দায়িত্বহীনতা। গোপন কূটনীতিতে রাজা বা তাঁর প্রতিনিধি কাজ পরিচালনা করতেন। ফলাফলের সমস্ত দায়দায়িত্ব সেই ব্যক্তির ওপর গিয়ে পড়ত। তিনিও দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারতেন না। কিন্তু প্রকাশ্য কূটনীতিতে জনগণ জানেই না যে তারা সার্বভৌম। বিদেশনীতিতে তারা সার্বভৌম এ কথাটির অর্থই তাদের কাছে বোধগম্য নয়। ফলে দায়িত্ববোধও গড়ে উঠতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য কূটনীতি একটি প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। কেবল জনপ্রিয়তা যদি কূটনীতিক কাজকর্ম ও অন্যান্য চুক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠি হয় তাহলে শেষপর্যন্ত এটি অচলাবস্থার মুখোমুখি হবে। তিনি বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক কূটনীতি হল সেই কূটনীতি যা রাজনীতিবিদ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু এরা কখনও কূটনীতি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারে না। কারণ এরজন্য প্রয়োজন দক্ষতা, নিপুণতা ও বিশেষ ধরনের জ্ঞান। এইসমস্ত যোগ্যতা সাধারণ নাগরিক বা রাজনীতিবিদদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না।

উপর্যুক্ত সমালোচনার ফলে প্রকাশ্য কূটনীতির কোনো কোনো পর্যায় সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কারণ রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে আরম্ভ করে পেশাগত কূটনীতিবিদ অনুভব করেন যে কূটনীতিকে পুরোপুরি প্রকাশ্য করা ঠিক নয়। তাঁরা বলেন কূটনীতির নানা পর্যায় থাকে। আলাপ-আলোচনা, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি। প্রকাশ্য কূটনীতি মানে এই নয় যে সমস্তরকম আলাপ-আলোচনা বা মতবিনিময় প্রকাশ্যে সম্পাদিত হবে, কোনোরকম গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে না। আলোচনা গোপনে চলবে। তবে আলোচনার পর যেসমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় সেগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ্য চুক্তি গোপনে সাধিত হলে আপত্তি থাকবে না। পরবর্তীকালে উড্রো উইলসন বলেছিলেন : When I pronounced for open diplomacy, I meant not that there should be no private discussion of delicate matters, but that not secret agreements should be entered into, and that all international relations, when fixed, should be open, above board and explicit. উইলসনের এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর প্রকাশ্য বনাম গোপন কূটনীতি সম্পর্কে আর জটিলতা থাকেনি। কারণ তিনিই ছিলেন প্রকাশ্য কূটনীতির প্রধান প্রবক্তা।

হার্টম্যান চলতি কূটনীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তাঁর মতে : a curious new hybrid form of diplomacy is much used today. হার্টম্যান বলতে চেয়েছেন যে বর্তমান কূটনীতি প্রকাশ্য ও গোপন উভয়ের সংমিশ্রণ। সচিব পর্যায়ের আলোচনা অধিকাংশস্থলে গোপনে হয়ে থাকে। আবার শীর্ষসম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন মিলিত হন তাঁরা সবকিছু প্রকাশ্যে করে থাকেন। গোপনীয়তাকে প্রশ্রয় দিতে চান না। রাষ্ট্রসংঘের সনদ প্রকাশ্য কূটনীতিকে সমর্থন করলেও সদস্যরা যখন কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন তখন তাঁরা গোপনেই করে থাকেন। সুতরাং গোপন কূটনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক থেকে বিদায় নেয়নি। অনেকে বলেন সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি কূটনীতিক কাজকর্ম প্রকাশ্যে করতে চায় না। কিছু কিছু ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে নিলেও বেশিরভাগ বিষয় গোপনে হয়। কেবল সমাজবাদী রাষ্ট্রকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, বিবাদাবসান নিয়ে যে দফায় দফায় আলোচনা হল তাও গোপনে। এসমস্ত বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা কোনো পক্ষই সমর্থন করেনি। উভয়পক্ষের ধারণা আলোচনা প্রকাশ্যে হলে এর অগ্রগতি ব্যাহত হত। আবার রাষ্ট্রসংঘের বিতর্কিত ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ প্রকাশ্যে আলোচিত হয়। কারণ কূটনীতিক মতবিনিময়কে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর অহেতুক গোপনীয়তার আবরণ চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিসংগত নয়।

ওপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে কূটনীতি গোপন থাকবে না প্রকাশ্যে আনা হবে সে ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত টানা যায় না। এ কথা সত্য যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ ব্যাপক হওয়ার ফলে প্রকাশ্য কূটনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠের

সমর্থনলাভ করছে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেমিক এ কথা বলবেন না যে জাতীয় স্বার্থ ও কূটনীতির আসল উদ্দেশ্য জলাঞ্জলি দিয়ে একে নিছক গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রকাশ্য করা হোক। এমনকি উইলসনও তা চাননি। হার্টম্যান-এর কথাই ঠিক যে আধুনিক কূটনীতি প্রকাশ্য ও গোপন দু-ভাবেই চলছে। আসল ব্যাপার হল উপযুক্ততা (expediency) ও জাতীয় স্বার্থ। এদের প্রয়োজনে কূটনীতিকে যে-কোনো পথ অবলম্বন করতে হতে পারে।

কূটনীতি ও গণতন্ত্র

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসন কংগ্রেসে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রকাশ্যে সম্পাদিত হবে এবং এরপর গোপনে কোনো আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া হবে না। জনসমক্ষে কূটনীতি তার কাজ করে যাবে এবং জটিলতা বর্জিত হবে। উইলসন-এর এই ঘোষণা পরবর্তীকালে কূটনীতিকে গণতন্ত্র-ভিত্তিক করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে অতীতে রাজারা বা শাসকগণ নিজেদের মধ্যে গোপনে চুক্তি করতেন। এমনকি পররাজ্য ভাগবাঁটোয়ারার ব্যাপারেও গোপনে চুক্তি স্বাক্ষরিত হত। যাদের রাজ্য অন্যেরা পেত তারা জানত না যে তাদের ভূখণ্ড অন্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই নীতিহীন কাজ অতীতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘর্ষের উসকানি দিত ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা বাড়াতে সাহায্য করত যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়ত বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ওপর। তাই কূটনীতিকে জনমতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলার প্রয়াস চালানো হয়।

হোলস্টি (ইনটারন্যাশনাল পলিটিক্স ষষ্ঠ সংস্করণ পৃ. ১৪৩) বলেছেন : In an age when "secret diplomacy" is viewed with suspicion and many diplomatic negotiations are open both to the press and public, a conference that is certain to receive expensive publicity around the world offers an excellent forum for influencing public attitudes. হোলস্টির মন্তব্য যথার্থ। গোপন কূটনীতিকে আজকাল সন্দেহের চোখেই দেখা হয়। কূটনীতিবিদগণ প্রকাশ্যেই আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন। সুতরাং সম্মেলন, আলোচনা কোনোটারই গোপনে করার প্রয়োজনীয়তা নেই। উদ্দেশ্যে যদি মহৎ হয় অথবা পারস্পরিক স্বার্থে তা নিয়োজিত থাকে সেক্ষেত্রে অন্ধকারে কূটনীতিক ক্রিয়াকলাপ চালানো গণতন্ত্র-বিরোধী ও অনৈতিক।

কূটনীতিকে গণতন্ত্রভিত্তিক করে তোলার পক্ষে যাঁরা যুক্তি দেখান তাঁদের বক্তব্য হল—যে-কোনো চুক্তি বা সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল জনগণের ওপর পড়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে জনগণের অজ্ঞাতসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনভিপ্রেত ও অনুচিত। গণতন্ত্রের একেবারে সারকথা হল যে কাজের প্রভাব যার ওপর পড়বে তাকে গোপনে রাখা ঠিক নয়। গণতন্ত্রের এই মৌলিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই নানা মহল থেকে কূটনীতিকে গণতন্ত্রভিত্তিক করে তোলার দাবি সোচ্চার হতে থাকে এবং বর্তমানে কূটনীতি অনেকখানি প্রকাশ্যে এসে গেছে এবং এর ফলে জনসাধারণ অবহিত হতে পারছে বিদেশের সঙ্গে কোথায় কী হচ্ছে।

বিজ্ঞান প্রাযুক্তিক কলাকৌশল এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বিকাশ আজ এমন স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে যে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের ওপর অথবা দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের জন্য গোপনে যতই আলোচনা বা শলাপরামর্শ করুন না কেন তা শেষপর্যন্ত গোপন থাকে না। সুতরাং গোপন কূটনীতি নামে যা পরিচিত তা প্রকৃতপক্ষে গোপন নয়। অতীতে প্রচারমাধ্যমগুলির এই রমরমা অবস্থা ছিল না। গোপনে করা কাজ গোপনেই থাকত। আজ কোনোকিছু গোপন থাকছে না। তাই যদি হয় তাহলে প্রকাশ্যে জনগণকে কূটনীতিক বিষয়াদিতে বিজড়িত না করার অর্থ হয় না।

অতীতের তুলনায় আজকাল জনসাধারণ রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সচেতন এবং বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। রাজনীতিক ও অন্যান্য সচেতনতাকে যথাযথ মর্যাদা দিতে হলে জনগণকে কূটনীতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তা ছাড়া আজকাল সরকারের কাজকর্মের ওপর জনমতের বিশেষ প্রভাব পড়ছে। সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধকারে রেখে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সিদ্ধান্ত নিতে চায় না। জনসংখ্যার শিক্ষিত ও সচেতন অংশকে সঙ্গে নিয়েই সরকার প্রশাসন চালাতে আগ্রহী। এই মনোভাব কূটনীতিকে গণতন্ত্রভিত্তিক হতে সাহায্য করেছে। অনেকসময় সরকার প্রশাসনিক বা অন্যান্য প্রয়োজনে কূটনীতিকে গোপনে রাখতে চাইলেও জনমতের চাপে পড়ে বা রাজনীতিক কারণে তাকে প্রকাশ্যে উপস্থাপিত করতে হয়।

রাষ্ট্রসংঘের আবির্ভাব গণতান্ত্রিক কূটনীতির পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। বিরোধ নিষ্পত্তি, চুক্তি সম্পাদন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি কূটনীতির পরম্পরাগত কাজগুলি আজ রাষ্ট্রসংঘ করছে এবং অতীতে যে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলা হত আজ রাষ্ট্র-সংঘ কূটনীতিবিদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় সেই গোপনীয়তা

অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। ১৯২টি রাষ্ট্র (বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যসংখ্যা) জানতেপারছে এই আন্তর্জাতিক সংগঠন কোথায় কী কাজ করছে এবং রাষ্ট্রগুলির জানার অর্থ হল জনগণের জেনে যাওয়া। বিশ্বপরিস্থিতিকে রাষ্ট্রসংঘ নানাভাবে নিজের আয়ত্তে আনায় কূটনীতির বিশাল চত্বরে গণতন্ত্রের আবির্ভাব আজ প্রকট হয়েছে। কেবল রাজনীতি নয়, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রসংঘ বিশেষভাবে তৎপর। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘকে অগ্রণী হতে দেখা যাচ্ছে। এভাবে কূটনীতির গণতান্ত্রিকীকরণ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

যে-কোনো উদারনীতিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও নানারকম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক বিষয়গুলিতে রীতিমতো উৎসাহ দেখায় এবং বিদেশনীতির রূপরেখা নির্মাণে অংশ নেয়। এইসমস্ত গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা পেশাদার ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি না হলেও কূটনীতিক কাজকর্ম পরিচালনায় একেবারে অপারগ নয়। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব যত বাড়ছে কূটনীতির গণতান্ত্রিকীকরণও তত বেড়ে চলেছে। নানা কারণে উদারনীতিক সরকার প্রেষ-প্রভাবী গোষ্ঠীর প্রভাব উপেক্ষা করতে পারে না। এটি যে কেবল রাজনীতিক বাধ্যবাধকতার জন্য হচ্ছে তা নয়। কূটনীতিবিদ নন এমন বহু ব্যক্তি কূটনীতি বিষয়টি খুব ভালো বোঝেন এবং তাঁরা যদি সরকারকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন তাহলে সরকার তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ব্যক্তিও আজকাল আংশিকভাবে হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতির কর্মকর্তা হয়ে উঠেছে। সুতরাং ব্যক্তিকে কূটনীতির আঙিনা থেকে সরিয়ে রাখা অনুচিত। মোটকথা, একুশ শতকের প্রথম দশকে এসে আমরা লক্ষ করছি কূটনীতির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রবেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং রাজনীতি সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনতা যত বাড়বে কূটনীতির গণতান্ত্রিকীকরণ তত বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি সরকারও এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সংবেদনশীল। জনসাধারণ কূটনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হোক সরকার তা চায় এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিরও উদ্যোগ নিচ্ছে।

কূটনীতির গৌরব হ্রাস

এমন মন্তব্য বহু পণ্ডিতব্যক্তিকে করতে শোনা যায় যে পরিস্থিতির চাপে অথবা অন্য নানা কারণে বর্তমানকালের কূটনীতি তার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থেকে ছিটকে পড়েছে। অতীতে এর গৌরব কতখানি ছিল আজকাল তা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার আঙ্কিক প্রাক্‌কলন সম্ভব নয়। তবে এ কথা সত্য যে কূটনীতি বর্তমানে বহুকিছুর নিয়ন্ত্রক নয়। এমনকি অতীতে কূটনীতির যখন রমরমা অবস্থা ছিল তখনও পর্যন্ত এর সম্বন্ধে কারুর উচ্চ ধারণা ছিল না। লোকে প্রায়ই বলতেন যে একজন সৎ লোককে মিথ্যে কথা বলার জন্য বিদেশে পাঠানো হয় নিয়মিত বেতন দিয়ে (a diplomat is an honest man paid to lie by his country)। সৎ ব্যক্তিকে মিথ্যে কথা বলার জন্য বিদেশে পাঠানো হলেও যাঁরা বিদেশে যেতেন তাঁরা কিন্তু সবাই সৎ ছিলেন না। তা যদি হত তাহলে কূটনীতি সম্পর্কে লোকের ধারণা আদৌ খারাপ হত না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা ও নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের নায়ক কূটনীতিবিদ বলে বহু অভিজ্ঞব্যক্তি মনে করেন। Vansittart বলেছেন :With the advent of Nazism and Communism, alike state conspirators, most of their representatives were involved. মতবিনিময় ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্ক ভালো করার পরিবর্তে কূটনীতির কাজ হল সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে দেওয়া। কূটনীতি জাতীয় স্বার্থকে সবরকম পরিস্থিতিতে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজের ঐক্য ও সংহতির দিকটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে। সেইজন্য বলা হয়েছে : Now-a-days the diplomacy..... is thoughtfully calculated to create and maintain bad relations. বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে হৃদ্যতা থাকুক কূটনীতি চায় না। জল ঘোলা করে ফেললে স্বার্থসিদ্ধির সুবিধা হয়।

কূটনীতির গৌরব হ্রাসের কারণ কী? Vansittart মনে করেন সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সরকারের আবির্ভাব ও বিস্তারলাভ কূটনীতির গৌরব হ্রাসের একটি কারণ। এককভাবে দল বা ব্যক্তির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি বলেন যে লৌহযবনিকার অপর পারের দেশগুলিতে কূটনীতিবিদদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া অথবা বিদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া আজকাল আর বিরল ঘটনা নয়। একনায়করা এত বেশি অসহিষ্ণু যে সামান্য কারণে বা কল্পিত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে কূটনীতিবিদদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এর ফলে কূটনীতি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যেসমস্ত কূটনীতিক প্রতিনিধি থাকতেন তাঁদেরকে নানা-প্রকার বিধিনিষেধের মধ্যে কাজ করতে হত। কারণ কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চায় না তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় ও রাজনীতির হালচাল পুঁজিবাদী দুনিয়ায় প্রচার হোক। অপরপক্ষে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের যেসমস্ত প্রতিনিধি বিদেশের রাজধানীতে যান তাঁরাও সহজে মুখ খুলতে চান না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার এক দশক আগে থেকে কূটনীতির তাৎপর্য কমতে থাকে এবং এটি প্রকট হয়ে ওঠে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে। হ্রাস পেতে পেতে এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে

যায়। এ মন্তব্য মর্গেনথাউ-এর। তিনি গৌরব হ্রাসের পাঁচটি কারণের উল্লেখ করেছেন। (মর্গেনথাউ, পৃ. ৫২৫)

প্রথমত, যোগাযোগব্যবস্থার বিকাশ কূটনীতির প্রভাবকে সংকুচিত করে দিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি যোগাযোগব্যবস্থাকে অনেকখানি উন্নত করে দেওয়ায় বিশ্বের সুদূরতম অঞ্চলের সঙ্গে অতি সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানগণ কূটনীতিবিদের সাহায্য ব্যতিরেকে যে-কোনো বিষয়ে মতবিনিময়ের জন্য সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। অতীতে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের এই কাজ করতে হত না। বিদেশের রাজধানীতে অবস্থিত স্থায়ী প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। বিদেশবিষয়ে স্থায়ী প্রতিনিধিরা ছিলেন অতীতে অপরিহার্য। বিদেশ-সংক্রান্ত জটিল বিষয়াদি আদানপ্রদানের অন্য সহজ পথ না থাকায় কূটনীতির প্রয়োজনীয়তা ছিল শীর্ষস্থানে। আরও জোরালো ভাষায় অন্য একজন সমালোচক বলেছেন : Given the advances of modern technology, the nature of the role of diplomat has changed. Even an ambassador at the highest level can no longer conduct his office as an independent agent. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কূটনীতিবিদের হাতে নেই। আলোচনার পরিবেশ বা উপাদান সংগ্রহ করে দেন মাত্র, শেষকথা বলার ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান বা বিদেশমন্ত্রীর।

দ্বিতীয়ত, কূটনীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির অবক্ষয় ঘটেছে। বহু প্রভাবশালী মহলের ধারণা কূটনীতি শান্তি অর্জনের পথকে প্রশস্ত তো করেই না বরং তাকে কণ্টকাকীর্ণ করে তোলে। অনেকে মনে করেন কূটনীতি মিথ্যা ও শঠতার মূর্ত প্রতীক। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ কূটনীতি। বহু গোপন চুক্তি পররাজ্য আক্রমণের পরিকল্পনা ও নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের নায়ক কূটনীতিবিদ। নানাপ্রকার গোপন চুক্তির ফলে বিশ্বে অনেকবার সংকট এসেছে। তাই অনেকে কূটনীতিকে খুব ভালোচোখে দেখে না। আজ কূটনীতির অবক্ষয়ে কারুর অনুশোচনা নেই। কূটনীতির অপকারিতার জন্যই উড্রো উইলসন প্রকাশ্য কূটনীতির পক্ষে জোর ওকালতি করেছিলেন।

সংসদীয় পদ্ধতির আবির্ভাব কূটনীতির গৌরব কমিয়ে দিয়েছে। *এটি হল তৃতীয় কারণ।* প্রথম মহাযুদ্ধের পর সংসদীয় পদ্ধতির অনুকরণে কূটনীতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালন করার পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় পারস্পরীয় কূটনীতির গুরুত্ব কমে যায়। লিগ অব নেশনস্ গঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সমস্যা লিগের সভায় পেশ করা হত আলোচনা ও সমাধানের জন্য। অর্থাৎ লিগ সভায় যে পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটে তা রাষ্ট্রসংঘে বিস্তৃতিলাভ করে। যে-কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনায় রাষ্ট্রসংঘের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে। এই পদ্ধতি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করায় অতীতের পরম্পরাগত কূটনীতি অলক্ষে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। সংসদীয় পদ্ধতিতে কূটনীতি রাষ্ট্রসংঘের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণতিলাভ করেছে। আন্তর্জাতিক সমস্যার প্রতি রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে এবং সমাধানে সবাইকে জড়িয়ে ফেলতে চায়। বিশ্বশান্তি ও নিরপত্তার ব্যাপারে একটি দিগন্ত উন্মোচিত করলেও পরম্পরাগত কূটনীতির মূলে কুঠারাঘাত করে। অতীতে যে কাজটি ছিল কূটনীতিবিদের একচ্ছত্র পরে তা রাষ্ট্রসংঘ দখল করে নেওয়ায় কূটনীতির গুরুত্ব কমে যায়।

সংসদীয় পদ্ধতিতে কূটনীতির অন্য একটি বিকল্প হল গণ সংসদীয় পদ্ধতি এবং এর আবির্ভাব পরম্পরাগত কূটনীতির প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে। বহু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা বিদেশমন্ত্রী মিলিত হতেন নিজেদের মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য। প্যারিস শান্তিসম্মেলন এই ধরনের একটি গণ সংসদীয় পদ্ধতি। বিদেশমন্ত্রীরা একত্র মিলিত হয়ে তর্কবিতর্ক করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভোটাভুটিও হয়। আলোচনা ও ভোট সবকিছুই ঘটে প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রথা চালু হওয়ায় পরম্পরাগত কূটনীতির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

কূটনীতির ক্রিয়াকলাপ ও বলিষ্ঠ বিদেশনীতি নির্মাণে অতীতে মার্কিন কূটনীতিবিদগণের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ দেখা গেল এই প্রয়োজনীয়তার স্রোতে ভাটার টান পড়েছে। এর পেছনে একটিমাত্র ব্যক্তির যথেষ্ট অবদান ছিল এবং তিনি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। তিনি অসাধারণ দক্ষ ও পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। বিদেশনীতির যাবতীয় পর্যায় তিনি দেখাশোনা করতেন। বলা যেতে পারে মার্কিন বিদেশনীতি এককভাবে রুজভেল্টের মস্তিষ্ক-শিশু (brain-child)। দীর্ঘ বারো বছর রুজভেল্ট বিদেশনীতির চত্বরে কাউকে প্রবেশ করতে দেননি এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিও আসেননি। তাঁর মৃত্যুর পর বিদেশদপ্তর ও কূটনীতি দুইই অবহেলিত হতে থাকে। বিশেষ করে যোগ্যব্যক্তি কূটনীতিক কাজে অনুৎসাহী হওয়ায় এর মর্যাদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তৃতীয় দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কূটনীতির যে গুরুত্ব হ্রাস শুরু হয়েছে তার আর পুনরুজ্জীবন ঘটেনি।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে কূটনীতির অবমূল্যায়ন ঘটেছিল বলে অভিজ্ঞমহলের ধারণা। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবের পর সাম্যবাদী সরকার জার আমলের কূটনীতিক প্রথাকে

করে দেয়। তার শাসনকালে যাঁরা কূটনীতিক কাজ করতেন তাঁদেরকে সরাসরি উপেক্ষা করা হয় কিন্তু নতুন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে নিয়োগের ব্যবস্থাই করা হয়নি। সেই সময় থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে কূটনীতি একটি অবহেলিত প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে আসে। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের কূটনীতিক সম্পর্ক আদৌ ভালো ছিল না। ফলে তার আমলে কূটনীতি যতখানি বিশেষ মর্যাদা পাচ্ছিল তার অবসান ঘটে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী সোভিয়েতের নতুন শাসকগোষ্ঠীর ধারণা জন্মায় যে বুর্জোয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক জিইয়ে রেখে লাভ নেই। পূর্বতন সোভিয়েত নেতারা মনে করতেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত সাময়িক। পুঁজিবাদের ধ্বংস হতে বিলম্ব লাগবে না। পুঁজিবাদের পরে নতুন সাম্যবাদী সরকার স্থাপিত হলে গোটা কূটনীতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজাতে হবে। পূর্ব ইউরোপ ছাড়া আর কোথাও বিপ্লবী সরকার স্থাপিত হয়নি এবং কূটনীতিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রেক্ষাপটে নতুন করে ঢেলে সাজাবার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়নি।

পঞ্চমত, বিশ্বরাজনীতির চরিত্র পরম্পরাগত কূটনীতিকে পর্দার আড়ালে সরিয়ে দিয়েছে। বৃহৎশক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বের সামরিক পরিস্থিতিও এদের নিয়ন্ত্রণে। এ অবস্থায় সমস্যা দেখা দিলে কূটনীতিবিদরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে মীমাংসার জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন না। বৃহৎশক্তিবর্গের একগুঁয়েমির মুখে কূটনীতিবিদরা অসহায়। বৃহৎশক্তিবর্গের নেতাদের অদ্ভুত মনোভাব কূটনীতির গুরুত্ব হ্রাসের বিশেষ কারণ। একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে হলে প্রত্যেকের নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। কার্যক্ষেত্রে নেতারা মনে করেন যে নমনীয়তার অর্থ হল জাতীয় স্বার্থ ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, তাই তারা নমনীয়তার পথ এড়িয়ে যেতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কূটনীতিও সম্যকরূপে বিকাশলাভ করতে পারেনি।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অস্বাভাবিক প্রাধান্যহেতু যে কূটনীতির গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে তা নয়, অপরাপর বিষয়েও বিশ্বরাজনীতির জটিলতা অতীতের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া একটি প্রবণতার মধ্যে স্থিতিশীলতা থাকছে না। দ্বিমেরুবাদ, বহুমেরুবাদ, দাঁতাত ও স্নায়ুযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কোনোটাই স্থায়িত্বলাভ করতে পারেনি। এই গতিশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সাযুজ্যবিধান করে চলতে কূটনীতি পারেনি। এই দিকে লক্ষ রেখে লার্কে ও সৈয়দ যথার্থই বলেছেন : Diplomacy in the contemporary era has not proved able to cope adequately with the dilemmas of politics. Its inadequacy has been so obvious that some critics have been moved to speculate the end of the traditional diplomacy. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কূটনীতির গতিপ্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে অতীতে কূটনীতি যেসমস্ত কাজ করত, বর্তমানে তা করে না। বরং কাজগুলি এড়িয়ে যাওয়া বা না করাই এই সময়ের কূটনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কূটনীতির গুরুত্ব কি প্রকৃতই হ্রাস পেয়েছে? কূটনীতির গুরুত্ব হ্রাস শীর্ষক আলোচনার দিকে তাকালে মনে হতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে কূটনীতির গুরুত্ব বলতে কিছুই নেই। কার্যক্ষেত্রে তা নয়। এখনও পর্যন্ত কূটনীতি বিদেশনীতি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। বিদেশনীতির বাস্তবায়ন কূটনীতি ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। নিরপেক্ষ বিশ্লেষক এমন কথা বলবেন না যে কূটনীতিবিদের সাহায্য ছাড়াই বিদেশনীতি কার্যকর হয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চরিত্র বদলে গেছে। সুতরাং পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলতে হলে কূটনীতিকেও তার কৌশল বদলাতে হবে। কূটনীতির কিছু পরিবর্তন মানে এর গুরুত্ব হ্রাস নয়। তবে পরম্পরাগত কূটনীতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অতীতে যেমন কূটনীতিবিদরা সর্বেসর্বা ছিলেন বর্তমানে তা নয়। শীর্ষসম্মেলনে যেসমস্ত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানরা মিলিত হন তাঁদেরকে নানা দিক থেকে সাহায্য করার জন্য কাজকর্মে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কূটনীতিবিদ থাকেন। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা বিদেশমন্ত্রী কেউই কূটনীতিক কাজকর্মে পর্যাপ্ত পরিমাণে অভিজ্ঞ নন। অতীতে আজকের মতো শীর্ষসম্মেলন ছিল না এবং কূটনীতিবিদকে এ কাজ করতে হত না। কেউ যদি বলেন যে যেহেতু শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেহেতু কূটনীতিবিদরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছেন তাহলে বলা উচিত এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কেবল এটুকু বলা যেতে পারে কূটনীতিবিদরা পর্দার আড়ালে চলে গেছেন। কিন্তু গুরুত্ব অবলুপ্ত হয়নি।

Lord Vansittart বলেছেন যে উনিশ শতকের কূটনীতিবিদরা চালাক ও উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যথেষ্ট কর্তৃত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান ছিলেন। বিদেশনীতি সম্পূর্ণভাবে তাঁদের দ্বারাই পরিচালিত হত। আজকালকার কূটনীতিবিদদের হাতে এত ক্ষমতা ও প্রভাব নেই। কিন্তু কূটনীতিক কাজকর্ম ও কূটনীতি বিষয়ক নীতি-সমূহের সঙ্গে তাঁরা আরও গভীরভাবে জড়িত। Vansittart আরও বলেছেন যে অতীতের কূটনীতিবিদদের তুলনায় বর্তমানের কূটনীতিবিদরা অধিকতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক বেশি।

(২) প্রচারণা বা প্রোপাগান্ডা

ধারণাটির জন্ম

প্রচারণা ধারণাটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বহুলপ্রচলিত হলেও এর জন্ম কিন্তু রাজনীতিশাস্ত্রে নয়। কয়েক শতক আগে রোমান ক্যাথলিক গির্জা ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচারের উদ্দেশ্যে যে কৌশল অবলম্বন করত তাকেই বলা হত প্রচারণা বা প্রোপাগান্ডা (Originating in an office of the Roman Catholic Church charged with the propagation of faith (*de propaganda fidel*) the word entered common usage in the second quarter of the twentieth century to describe attempts by totalitarian regimes to achieve comprehensive subordination of knowledge to state policy. *Oxford Concise Dictionary of Politics.)*। অর্থাৎ শুরুতে ধর্মীয় নেতারা নিজেদের চিন্তা ও বিশ্বাস অন্যদের মধ্যে প্রচারের জন্য যে কৌশল ব্যবহার করতেন সেটাই প্রচারণা নামে খ্যাত হয়। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক নাগাদ প্রচারণা সেই ধর্মীয় গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। রাজনীতিক নেতা ও ক্ষমতার দালালরা নিজেদের মতবাদ অন্য জনগোষ্ঠী বা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তি ও বিভিন্ন উপায়কে কাজে লাগায় যাদের মধ্যে উল্লেখ্য হল রাজনীতিক দল এবং বর্তমানে জাতি-রাষ্ট্রগুলি বিদেশনীতিকে সফল প্রয়োগের জন্য প্রোপাগান্ডাকে নির্বিচারে ব্যবহার করে।

প্রোপাগান্ডার সংজ্ঞা

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশারদ প্রচারণা বা প্রোপাগান্ডাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর পেঙ্গুইনের অভিধানের মতে—কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা চিন্তাধারা যাকে কিছুসংখ্যক লোক গ্রহণ করে তার জন্যে অযৌক্তিক উপায়গুলির সাহায্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াকে প্রচারণা বলা যায়। অর্থাৎ কিছুসংখ্যক লোককে একটি বিশেষ মত বা চিন্তার অধীনে আনতে হবে এবং তার জন্যে সম্মতকরণ কৌশল প্রযুক্ত হয়। আর এই কৌশলের মধ্যে যুক্তিবাদিতা, সততা ও ন্যায়-নীতি বোধের স্থান থাকে না। অর্থাৎ পদ্ধতির চেয়ে উদ্দেশ্য প্রধান হয়ে দাঁড়ায় (Propaganda is the deliberate attempt at presuading people, either as individuals or in groups, to accept a particular definition of the situation by manipulating selected non-rational factors in their personality or in other social environments the consequent effect of this attempt being to change and mould their behaviour into a certain desired direction.)।

কিম্বল ইয়ুঙ্গ (Kimball Young) তাঁর *Handbook of Social Psychology* বইতে অভ্যন্তরীণ সমাজের প্রেক্ষিতে প্রচারণার সংজ্ঞা এভাবে প্রদান করেছেন : Broadly defined, this has to do with the deliberate use of persuasive methods or other symbolic techniques to change attitudes and ultimately to affect action. ইচ্ছাকৃতভাবে ও সম্মতকরণ উপায়ে অন্য জনগোষ্ঠীকে নিজমতে দীক্ষিত করে তোলার জন্য যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হয় সেটাই প্রোপাগান্ডা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রচারণা হল সেই পদ্ধতি বা কৌশল যা রাষ্ট্র নিজে বা নানা এজেন্সির মাধ্যমে প্রয়োগ করে এবং প্রয়োগের লক্ষ্য হল অন্য দেশ বা দেশের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভিন্নমত ও চিন্তার পরিবর্তনসাধন করে প্রচারকের (propagandist) মতের অনুকূলে আনা অথবা যদি আনা সম্ভব না হয় অন্ততপক্ষে সেই জনগোষ্ঠীকে পূর্ব মত সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় করা বা নিরপেক্ষ করে তোলা। আর এই কাজটি প্রচারক ইচ্ছাকৃতভাবে করে। প্রচারণা মনের ওপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করে কারণ মনের পরিবর্তন হলে মানুষের কাজকর্মের ওপর সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত হবে। প্রচারককে সেই কারণে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া প্রচারণার কাজে রাষ্ট্র বা তার প্রতিনিধি হাত দিতে চায় না।

প্রচারণার বৈশিষ্ট্য

(১) প্রচারণার উদ্দেশ্য যা হোক না কেন একে একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হিসেবে সকলে অভিহিত করেছেন। প্রচারক উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রচারের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্য রাষ্ট্রের জনগণের মতামতের পরিবর্তনসাধনের নিমিত্ত এই ইচ্ছাকৃত উপায় অবলম্বনের রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। এমন হতে পারে যে জনগোষ্ঠীর মতের পরিবর্তন করা গেল না। সেক্ষেত্রে আগের মতকে সক্রিয় না হতে দেওয়া।

(২) প্রচারণাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞগণ একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। কারণ চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি মানসিকতা ইত্যাদির পরিবর্তন হলে তার প্রভাব কাজের ওপর পড়বে। সে-কারণে প্রচারণার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী মনের জগতে পরিবর্তন আনার দিকে বেশি নজরদানের কথা ভাবেন। মানুষের মনে (অবশ্য সে যদি চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়) একাধিক চিন্তা বা ভাবনা সক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে। প্রচারণা দেখে যে এই ভাবনাগুলি রাষ্ট্রের লক্ষ্যসাধনের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে বা করে এবং তার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। তখন প্রচারক নির্দিষ্ট

উপায়ে এবং সচেতনতার সঙ্গে অগ্রসর হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা ভাবনাকে অকেজো বা নিরপেক্ষ করে ফেলার জন্য। ব্যক্তির মনে পোষিত চিন্তাগুলির মধ্যে একটি সংঘাত সৃষ্টি করে এক বা একাধিক চিন্তাকে অকেজো বা নিরপেক্ষ করে তুলতে প্রোপাগান্ডা চায়। প্রোপাগান্ডার আগে পর্যন্ত যে চিন্তা ছিল বিরোধহীন, প্রচারণার ফলে সেই চিন্তা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। সুকৌশলে প্রচারণা মানুষের মনে যে চিন্তার একটি আসন তৈরি করেছিল তার পাশে আর-একটি চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দুটি চিন্তার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে এবং টার্গেট (target) এলাকার জনসাধারণের মনে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। নিরন্তর প্রচারণা শেষপর্যন্ত পুরানো চিন্তার ভিত্তি ও অবয়বকে দুর্বল করে ফেলে।

(৩) প্রচারণার মধ্যে সম্মতকরণ প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সচরাচর বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মনের বা চিন্তার পরিবর্তন করা প্রোপাগান্ডার কাজ নয়। কারণ তা করতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আবির্ভূত হতে পারে। নিরন্তর প্রচার চালিয়ে লক্ষ্যে উপস্থিত হতে প্রচারণা চায়। তা ছাড়া প্রচারণা যে কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে তার মধ্যে সাধারণত বলপ্রয়োগের সুযোগ নেই।

(৪) বৈজ্ঞানিক উপায়ে অগ্রসর বা পান্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতিতে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যে উপস্থিত হওয়া বা জনগণকে সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করা প্রচারণার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং পন্ডিতি উপায় বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর প্রচারণা খুব বেশি নির্ভর করতে চায় না। কৌশলে সত্য গোপন করে নিজমতের অনুকূলে অন্যের মতকে আনা প্রচারণার অন্যতম কাজ। যে ভাষা ও কৌশল সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারবে বলে প্রচারক মনে করে সে তাকেই অবলম্বন করে কাজে নেমে পড়ে।

(৫) প্রচারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি বিষয় হলেও সারা বিশ্বের জনগণের উদ্দেশে এটি ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য প্রচারক কতকগুলি এলাকা বা জনগোষ্ঠী নির্বাচন করে নেয় যেগুলিকে 'টার্গেট' (target) এলাকা বা লক্ষ্যবস্তু বলা হয়। এই 'টার্গেট' এলাকার জনগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট দেশের হতে পারে আবার একাধিক দেশের জনগোষ্ঠীও হতে পারে। কোন্ জনগোষ্ঠীর মননের ওপর পরিবর্তন আনতে প্রোপাগান্ডা চায় তা প্রচারক কর্তৃক ব্যবহৃত স্ট্র্যাজেডি বা রণকৌশলের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বিশেষ একটি বা একাধিক জনগোষ্ঠীর মনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনলে লক্ষ্য পূর্ণ হবে তা প্রচারক কাজে নামার আগে স্থির করে ফেলে। দেখা গেছে একাধিক রাষ্ট্রের জনগণের উদ্দেশে প্রচারণা প্রচার কাজ চালানো হয়েছে যেমন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পুঁজিবাদী বা ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য এই গোষ্ঠীর নানা দেশের জনগণের মধ্যে প্রচার চালাত। একই কাজ ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী করত। উভয়গোষ্ঠী এভাবে প্রচারণার কাজে লিপ্ত ছিল।

(৬) প্রচারণাকে অনেকে নীতিনিরপেক্ষ একটি উপায় বলে মনে করতে চান। কারণ প্রচারণা নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপে অনাগ্রহী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বা যুদ্ধচলাকালীন সময়ে হিটলার ও মুসোলিনি নিবিড়ভাবে প্রচারণায় যুক্ত ছিলেন। বিরোধী শিবির সম্পর্কে তাদের প্রচার বা মূল্যায়নের পেছনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্থান ছিল না। এমন একটি ধারণা প্রচারকের মনে গড়ে ওঠে যে নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধভিত্তিক প্রচারণা সাফল্যের ঝুলি পূর্ণ করতে পারে না তাই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

(৭) প্রোপাগান্ডা গোপন ও প্রকাশ্য—দুইই হতে পারে। প্রচারক অনেকসময় জানতে দেয় না যে জনগণের চিন্তাকে বদলে দেওয়ার জন্য প্রচারের কাজ চালানো হচ্ছে। তারা যদি জানতে পারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। চেতনাবোধের আড়ালেই প্রচারের কাজ চলে। কিন্তু প্রচারণা সবসময় গোপন হবে এমন নিশ্চয়তা নেই। জনগণকে বিশেষ ব্যাপারে সর্তক করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রচারণার আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন বিশ্বায়ন বা উদারীকরণের কুফলগুলি সম্পর্কে জনগণ ওয়াকিবহাল নাও হতে পারে। সুতরাং সতর্ক করে তুলতে হলে এগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে প্রচার চালানো প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে প্রচারণা যখন প্রকাশ্যে কাজ শুরু করে তখন পুরোপুরি মিথ্যাকে আশ্রয় করে সে কাজে নামে না। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বহুজাতিক সংস্থার ত্রুটিগুলির বাস্তব সত্যতা জনগণের সামনে তুলে ধরতে প্রোপাগান্ডা চায়। বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর যে প্রচার চলে তাকেও এক প্রকার প্রচারণা বলা যেতে পারে এবং এটি প্রকাশ্য। সমাজবাদী রাষ্ট্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এবং উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উদারনীতিবাদের যে প্রচার করে সেগুলি প্রকাশ্য এবং যা প্রচার করা হয় তার মধ্যে কিছু সত্যতা থাকেই।

(৮) প্রচারণা মূলত রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অর্থাৎ যত প্রচারণা করা হয় কমবেশি সবই চায় বিরুদ্ধ রাজনীতিক মতবাদ বা মতাদর্শকে শক্তিহীন, নিরপেক্ষ বা অকেজো করে ফেলা। প্রচারণার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে হলে একজন প্রচারক বা বক্তব্য প্রেরক (communicator) দরকার। *দ্বিতীয়ত,* একটি 'টার্গেট' এলাকা বা জনগোষ্ঠী থাকবে। *তৃতীয়ত,* প্রচারণার মাধ্যম না থাকলে চলবে না। বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ মাধ্যমে দুইই ব্যবহৃত হয়। *চতুর্থত,* সংকেত বা প্রতীক

থাকতে হবে। এই চারিটি উপাদানের সমন্বয়ে প্রচারণার কাজ সাধিত হয়। কোনো একটির অনুপস্থিতি প্রচারণার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। এমনকি ব্যর্থ করে দেবে।

(৯) প্রচারক প্রচার কাজ চালাবার সময়ে সমস্ত তথ্য ব্যবহার করে না। প্রচারণার উদ্দেশ্যে যেসমস্ত তথ্য প্রাসঙ্গিক কেবল সেই তথ্যগুলিকে নেয়। তাই তথ্যের নির্বাচন প্রচারকের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ।

(১০) প্রচারণার আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল প্রতীক বা সংকেত ব্যবহার করা। সংক্ষেপে বার্তা পাঠাতে হলে সংকেতের প্রয়োজন আছে। এই সংকেত লিখিত বা ছবির আকারে হতে পারে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সংকেত ব্যবহৃত হয়।

প্রচারণার শ্রেণিবিভাগ

আগেই বলা হয়েছে যে প্রচারণা দুরকম—গোপন ও প্রকাশ্য। কোন্ প্রকার প্রচারণা কাজে প্রয়োগ করা হবে তা পরিস্থিতি, প্রচারকের উদ্দেশ্য ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। এই দু-প্রকার প্রচারণা ছাড়াও অন্যান্য প্রচারণার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—প্রচারণা রূপান্তরমূলক (conversionary), বিভেদমূলক (divisive) এবং সংহতিমূলক (consolidation) হতে পারে।

(১) **রূপান্তরমূলক প্রচারণা :** বিশ্বের নানা স্থানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গির্জা, মসজিদ, মন্দির, ধর্মীয় সংগঠন রূপান্তরমূলক প্রচারণার কাজে লিপ্ত থাকে। এইসমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নিজ নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে প্রচার করে থাকে যার উদ্দেশ্য হল গোষ্ঠীর সদস্যদের নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে প্রচারকের ধর্ম গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করা। ইউরোপের খ্রিশ্চান মিশনারিগুলি কয়েক শতক ধরে খ্রিস্টধর্ম বিশ্বের নানা স্থানে বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে প্রচার করে আসছে যার ফলে প্রচারের আগে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। প্রচারের পরে বহুসংখ্যক খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীর আবির্ভাব ঘটে। খ্রিশ্চান মিশনারিগুলি আজও তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশে রীতিমতো সক্রিয়। খ্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় রূপান্তরের জন্য প্রচারণাকে একটি কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করে এবং বিশ্বের নানা স্থানে এই কাজ ঘটে থাকে। অতীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এই কাজ করেছিল যার ফলে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ভারতের বাইরে ঘটেছিল।

(২) **বিভেদমূলক প্রচারণা :** ধর্মীয় ও রাজনীতিক কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে 'টার্গেট' এলাকার জনগণের মনে ওই রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরির জন্য বিভেদমূলক প্রচারণাকে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ ঘটেছিল। যুদ্ধজনক পরিস্থিতিতে এক রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যেকার ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচারণা প্রয়োগ করে। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের অনুপস্থিতি ঘটলে এক রাষ্ট্রের প্রচারণার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বা সংগঠন অন্য রাষ্ট্রের বা শত্রু-রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে সত্য-মিথ্যায় ভরপুর প্রচারকাজ চালায় যার প্রধান লক্ষ্য হল যাদের উদ্দেশ্যে প্রচার চালানো হচ্ছে তাদের মনে নতুন চিন্তা সৃষ্টি করা। 'টার্গেট' এলাকার জনগণ যে চিন্তা মনে পোষণ করে আসছিল তার ভিত টলিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ পুরানো ও নতুন চিন্তার মধ্যে বিভেদ তৈরি করা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিভুক্ত দেশগুলির নেতা ও রাজনীতি-বিদরা জোর গলায় প্রচার করেছিলেন যে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির জনগণের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ বা শত্রুতা নেই। তাদের শত্রুতা নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। কারণ এই দুই মতবাদ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পয়লানম্বর শত্রু। সুতরাং অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা স্থাপনের নিমিত্ত যুদ্ধ বলে বিবেচনা করতে হবে। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটবে। এই ধরনের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মিত্রশক্তি ইটালি ও জার্মানির জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

(৩) **সংহতিমূলক প্রচারণা :** নানা কারণে এক রাষ্ট্রের জনগণ অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং দীর্ঘদিন থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু নিজ দেশের বা জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য বা দুর্বলতা তারা ত্যাগ করতে পারেনি। অনেকসময় এই সমস্ত ব্যক্তির নিজ দেশের বা জন্মভূমির প্রতি আনুগত্য বা মমত্ববোধ উসকে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র বা নানাপ্রকার এজেন্সি প্রচারণার কাজে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত বা তিক্ততা দেখা দিলে সংহতিমূলক প্রচারণা প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। অবশ্য সংহতিমূলক প্রচারণার সাথে সাথে বিভেদমূলক প্রচারণার আবির্ভাবও ঘটতে পারে। এক দেশের নাগরিক যখন অন্য দেশে বসবাস করে তখন সেই দেশের প্রতি দুর্বলতা ও আনুগত্য আপনা হতে জন্মে যায়। কিন্তু প্রচারণার ফলে সেই আনুগত্য আস্তে আস্তে শিথিল হতে শুরু করে এবং যে রাষ্ট্রে বসবাস করছে সেই রাষ্ট্রের জনগণ থেকে অল্প পরিমাণে হলেও দূরে সরে যায়। বিচ্ছেদ বা বিভেদ এভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই প্রবণতাকে আমরা অবধারিত বলে মনে করতে পারি। কারণ এক জায়গায় সংহতির সম্ভাবনা দেখা দিলে অন্য জায়গায় তা বিভেদের সূত্রপাত ঘটাবেই। যা হোক, প্রোপাগান্ডার এই তিনটি রূপ প্রচলিত। অন্য রূপও অনেকসময় দেখা যায়।

প্রচারণার সাফল্যের শর্ত

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য হল একটি বা একাধিক দেশের বা এলাকার জনসাধারণ রাজনীতি বিষয়ে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ও থাকতে পারে। তবে রাজনীতি মুখ্য স্থানাধিকারী) যে মনোভাব পোষণ করে তাকে অপসারিত করে সেই স্থানে প্রচারকের চিন্তাধারা স্থাপন করা এবং তা যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে পারতপক্ষে আগের চিন্তাধারা বা মতাদর্শকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে প্রচারণাকে এই লক্ষ্যে উপস্থিত হতে হলে কতকগুলি পূর্বশর্তের বাস্তবায়ন দরকার।

প্রথমত, প্রচারকের বিরুদ্ধে 'টার্গেট' এলাকার জনগণের তীব্র ক্ষোভ বা বিরোধী মনোভাব বা দ্বেষ বা হিংসা থাকবে না। অর্থাৎ 'টার্গেট' (target) এলাকার জনগণ যদি তীব্র বিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাহলে প্রচারকের প্রচারণা জনগণের মনের ওপর ছাপ বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, যাদের উদ্দেশে প্রচার করা হচ্ছে তাদের মনের মধ্যে রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে কোনো ভাবনা স্থায়ীভাবে আসন তৈরি করে নেবে না। অর্থাৎ রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি টার্গেট এলাকার জনগণের আনুগত্য গভীরভাবে প্রোথিত থাকবে না। এই আনুগত্যের প্রভাব যদি সমাজের সকল স্তরে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে তাহলে প্রচারণা তাকে উৎপাটিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

তৃতীয়ত, প্রচারক যে বিষয় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে প্রচার চালাচ্ছে সেই বিষয় সম্পর্কে ওই জনগণ অন্তত আংশিকভাবে সহমত পোষণ করবে। এই অবস্থা থাকলে প্রচারকের পক্ষে জনগণের মতের পরিবর্তন করা সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই প্রচারণার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রচারণার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি তার স্বরূপ 'টার্গেট' এলাকার জনগণের নিকট প্রকাশ করে না। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের প্রচারকগণ এই কৌশল অবলম্বন করত। স্বরূপ উন্মোচিত হলে প্রচারণার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কা থাকত। অনেকে একে *কালো প্রচারণা* বলে অভিহিত করেন। নাৎসি ও ফ্যাসি শাসকদের প্রচারকরা কখনও সংবাদের উৎস ও প্রচারকের নাম উল্লেখ করত না।

চতুর্থত, প্রচারক 'টার্গেট' এলাকার সমস্ত জনগণের ওপর প্রভাব স্থাপনের কথা যদি ভাবে তাহলে সাফল্য নাও পাওয়া যেতে পারে। কারণ অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নাগরিক একটি বিষয়ে স্থিতিশীল মনোভাব পোষণ করে এবং তাদেরকে সেই বিশ্বাস থেকে সহজে সরিয়ে আনা যায় না বা আনা কষ্টকর ব্যাপার। সুতরাং প্রচারকের উদ্দেশ্য হবে অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়সের জনগণের মধ্যে প্রচারণা চালানো। কারণ কোনো বিষয়ে যুব সম্প্রদায় অপরিবর্তনীয় মনোভাব পোষণ করে না। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদেরকে সহজে প্রভাবিত করা যায়। যে প্রচারণা এই দিকটি মনে রাখতে পারে তার পক্ষে সফল হওয়া সহজ হবে।

পঞ্চমত, প্রচারণাকে সফল করে তুলতে হলে জনগণের মনস্তত্ত্ব (crowd psychology) সম্বন্ধে প্রচারককে সম্যকরূপে ওয়াকিবহাল হতে হবে। যেহেতু প্রচারণা হল একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। প্রচারক যদি 'টার্গেট' এলাকার জনগণের মানসরাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে তাহলে প্রচারণার পক্ষে ইপ্সিতফল অর্জন করা সম্ভব হবে না।

ষষ্ঠত, প্রচারণাকে সফল করে তোলার জন্য আর-একটি পূর্বশর্তের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি এবং তা হল প্রচারক সময় ও স্থান বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্বাচন করবে। অর্থাৎ, কোন্ সময় প্রচার কাজের সূত্রপাত ঘটালে সর্বাধিক সাফল্য আসতে পারে সে বিষয়ে প্রচারক সঠিক তথ্য সংগ্রহ করবে। 'টার্গেট' এলাকা স্থির করা হলেও মনে রাখতে হবে যে এই এলাকার সমস্ত ব্যক্তি একই মনোভাব নাও পোষণ করতে পারে। কোনো বিষয়ের প্রতি যাদের আনুগত্য দৃঢ়প্রোথিত নয় প্রথমে তাদের মধ্যে প্রচারণা চালাতে হবে এবং সুফল পাওয়া গেলে অন্যদের প্রভাবিত করার কাজে অগ্রসর হতে হবে। আমরা মনে করি এটি সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। উপযুক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে অনুসৃত হলে প্রচারণা সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে বলে মনে করা হয়। আমরা বলতে পারি, সময়, স্থান ও কৌশল নির্বাচন করা হল প্রচারকের কাজ। একে স্ট্র্যাটেজিও বলা যেতে পারে।

প্রচারণার কৌশল

প্রচারণাকে সফল করে তোলার জন্য কতকগুলি কৌশল প্রচারককে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। স্থান-কাল ভেদে কৌশলগুলির পরিবর্তন হলেও প্রধান কৌশলগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। কয়েকটি কৌশলের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

(১) প্রচারক আবেগের নিকট আবেদন জানিয়ে থাকে। আর এজন্য প্রচারক 'টার্গেট' এলাকার জনগণকে বলে যে সে তাদেরই একজন। অর্থাৎ "আমি তোমাদেরই লোক এই বলে খ্যাত হোক"। অনেকসময় দেখা যায় যে সাধারণ মানুষ এর সত্যাসত্য বিচার না করে প্রচারকের কথা মেনে নেয়। একে আমরা একাত্মতা স্থাপনের কৌশল নামে অভিহিত করতে পারি।

(২) চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া। এই কৌশল অনেকসময় প্রচারণার কাজে ব্যবহৃত হয়। সমাজবাদীরা যখন প্রচারে নামে

তখন তারা বলতে আরম্ভ করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, পুঁজিবাদী ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদীরা প্রচারকালে বলে—লালদুর্গ, সমাজবাদ হল ধর্ম ও গণতন্ত্রের কবরস্থান ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রচারণার কাজে সমগ্র একটি ব্যবস্থাকে আক্রমণ বা চিহ্নিত করে উপস্থাপিত করা হয়।

(৩) **হস্তান্তরকরণ প্রক্রিয়া**। মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার ও মুসোলিনিকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের সমর্থক ও গণতন্ত্র অপহরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কারণ গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণমানুষের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। এই দুর্বলতাকে কাজে লাগানোই ছিল মিত্রশক্তি-গোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য। পুঁজিবাদীরা সাম্যবাদের ওপর ধর্মীয় অবিশ্বাসের তকমা চাপিয়ে দিয়েছিল। অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাস প্রবল।

(৪) **ঘটনা ও তথ্যের নির্বাচন ও ব্যাখ্যা**। নানাপ্রকার ঘটনা ঘটে থাকে এবং প্রচারকরা ইচ্ছানুযায়ী সেইসমস্ত ঘটনাকে নির্বাচন করে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ভারত-বিরোধী প্রচারে নামে। এমনকি ভারতের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের কাছে পাকিস্তান প্রচার করে বলে যে ভারত সরকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নয়। ভারতে আই. এস. আই. চক্রের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তান বলে যে এটা সন্ত্রাসমূলক কাজ নয়, কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনের জন্য তারা কাজ করছে।

(৫) **অন্যের ওপর দোষারোপ**। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পশ্চাৎপদ থাকার ব্যাপারে পুঁজিবাদী শোষণকে দোষী করে থাকে। এমনকি বলশেভিক পার্টির ক্ষমতা দখলের আগে রাশিয়ার পিছিয়ে পড়ার জন্য কমিউনিস্টরা জার শাসনকে দোষী করে। হিটলার বলতেন যে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের চক্রান্তের জন্যেই জার্মানির বৈষয়িক বিকাশ হয়নি। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে গণতন্ত্রের বিকাশ হচ্ছে না সর্বনিয়ন্ত্রণবাদের জন্য। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে রাজনীতিক অস্থিতিশীলতার পেছনে রয়েছে মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজ। এই জাতীয় প্রচার বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আজকাল দেখা যায়।

(৬) **মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা**। প্রচারণা অনেকসময় 'টার্গেট' এলাকার জনসাধারণের মনে নানা কৌশল অবলম্বন-পূর্বক আতঙ্ক সৃষ্টি করে। আতঙ্ক সৃষ্টির অন্যতম উপায় হল এই বলে প্রচার করা যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা ব্যক্তি সমস্ত সমাজের জনগণের পক্ষে নিরাপদ নয়। অথবা বিশেষ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার পরিপন্থী (Consciousness can be raised and attitudes changed, when audiences are made aware of an impending or imminent threat to their lives and welfare. *Holsti*, p. 168)। আন্তর্জাতিক সংকটের সময় অথবা দুই দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত দেখা দিলে আতঙ্ক সৃষ্টির কৌশলটি অনুসৃত হয়। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণের মনে প্রায়ই আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়। যদিও এই ধরনের প্রচারণা মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, তবু বলতে বাধা নেই যে আতঙ্ক সৃষ্টির মধ্যে সেই পারমাণবিক অস্ত্র সম্বন্ধে জনগণকে সতর্ক করে দেওয়াই আসল লক্ষ্য। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল বিস্ফোরণ রোধ করতে হলে কী কী উপায় অবলম্বন দরকার। শুধু তাই নয় জনসাধারণকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া। এভাবে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচারক নিজের কাজ হাসিল করে ফেলে। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আতঙ্ক সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হল নিজের লক্ষ্য চরিতার্থ করা।

উপসংহার

প্রচারক কী কী কৌশল অবলম্বনপূর্বক উদ্দেশ্য সফল করে তুলবে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ওপরে উল্লেখ করা হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই কৌশলগুলি অপরিবর্তনযোগ্য বা শেষ নয়। বিদেশনীতিকে সফল করে তুলতে হলে প্রচারণা বিশেষ সড়ক ধরে অগ্রসর হয় না। কৌশল অনেক থাকতে পারে এবং আছে। কোন্ কৌশল প্রয়োগ করলে লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়া যাবে সে বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য বা আদর্শ উপায় নেই। প্রচারক সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবে।

যেসমস্ত প্রচারণার উদ্দেশ্য মানবজাতির কল্যাণ করা সে ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নেই। নিরস্ত্রীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। এই ধরনের প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিভিন্ন রাষ্ট্রকে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র নিরন্তর প্রচার চালাচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সব মানুষ যাতে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ব্যাপক ও নিবিড় প্রচারে লিপ্ত। অনুরূপভাবে সকলপ্রকার দূষণ থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলি প্রচারণার কাজে নিযুক্ত। অতি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল দেশের জনগণকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলি প্রচারণার কাজে নেমে পড়েছে। প্রচারণার এই শুভ

দিকটি খুবই কাম্য। এই ধরনের প্রচারণাকে উৎসাহিত করাই উচিত এবং আমরা করেও থাকি।

কিন্তু প্রচারণার অশুভ দিকটি থেকে আমাদের সতর্ক থাকা বিশেষ দরকার। অশুভ দিকটি হল অনেকসময় প্রোপাগান্ডা একই জনগোষ্ঠীর নানা অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালায়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যকে গোপন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ও নানা রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততা বাড়ায়। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় প্রচারকরা প্রচারণাকে অত্যন্ত উন্নত স্থানে নিয়ে গেছে। প্রতিনিয়ত প্রচারণার কৌশলকে উন্নত ও সময়োপযোগী করা হচ্ছে। ফলে প্রচারণাও আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রচারণাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রচারণার স্থান

বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রচারণা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করছে বলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এই ধরনের মনে করার পেছনে কল্পনা বা অতিরঞ্জন নেই। বিশ্বরাজনীতির হালচাল সম্পর্কে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন প্রোপাগান্ডা বর্তমানে বিশ্বরাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কেন প্রোপাগান্ডা এত গুরুত্বপূর্ণ তার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) বিশ্বরাজনীতির চত্বরে বহু রাষ্ট্র বিশেষ করে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তুলতে চায় এবং তা করতে হলে ব্যাপক হারে প্রচারণা দরকার। নিজের ঢাক নিজে না পেটালে অন্যে তা পেটাবে এমন আশা কেউ করে না। ভাবমূর্তি, সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়াবার আশা না থাকলে প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা থাকতই না কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তা চায় না। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ।

(২) আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যেমন অনেক বিষয়ে সহযোগিতা দেখা যায় তেমনি তাদের মধ্যে সংঘাতের উপস্থিতি অকল্পনীয় নয়। সংঘাত দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সংঘাতের কারণ ও মীমাংসার পক্ষে প্রোপাগান্ডাও এসে যায়। এক পক্ষ অন্যপক্ষের ওপর সবসময় দোষারোপ করে এবং তা করা হয় প্রোপাগান্ডার মাধ্যমেই। আবার মীমাংসার সূত্র বের হলেই তার পক্ষে বিপক্ষে যেসমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয় তার জন্য প্রচারণা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে।

(৩) আগেই বলা হয়েছে যে প্রচারণা সবসময় সংকীর্ণ লক্ষ্যার্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় না। আগে আমরা দেখেছি যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশ্বজনমত জাগিয়ে তোলা বা সংহত করার জন্য এর ব্যবহার হয়। যেমন জন বিস্ফোরণ রোধ করা, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা, বিশ্বকে সমস্তপ্রকার দূষণ থেকে মুক্ত করা। এই বিষয়গুলির প্রতি বিশ্বের সকল শ্রেণির মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রোপাগান্ডাকে ব্যবহার করার প্রবণতা বাড়ছে। আমরা মনে করি যে এর যতই কুফল থাক না কেন কল্যাণমূলক কাজে প্রোপাগান্ডার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। প্রচারণা ছাড়া বিশ্বের জনমতকে সচেতন করার বিকল্প উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় সাফল্য আজ প্রচারণাকে সফল হতে সাহায্য করেছে। অথবা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অসামান্য অগ্রগতি রাষ্ট্রনায়কদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে নানাপ্রকার প্রচারের কাজে লিপ্ত হতে এবং শেষপর্যন্ত তা প্রচারণায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যদি আজ এই অবস্থায় এসে উপস্থিত না হত তাহলে রাষ্ট্রনায়কগণ প্রোপাগান্ডায় উৎসাহ বোধ করতেন না। তাই একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন : Technology has been of great assistance to the propaganda. প্রচারণার কাজে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৫) রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ নিজ বক্তব্য ও অবস্থান অন্যের নিকট স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার তাগিদ অনুভব করছে। কারণ তা করা না হলে যে-কোনো ইস্যু নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। সুতরাং কোনো রাষ্ট্রের অবস্থান ও বক্তব্যকে অন্যের বা অন্যদের সামনে উপস্থাপিত করতে হলে প্রোপাগান্ডা ব্যতিরেকে বিকল্প উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তা ছাড়া জাতীয় স্বার্থ বলতে একটি রাষ্ট্র কী বোঝে এবং তা সংরক্ষণের জন্য সে কী কী উপায় নিতে চায় তা অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সে কাজ কেবল প্রচারণা করতে পারে। প্রচারণা বিভিন্ন ইস্যুকে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে অন্যের নিকট উপস্থাপিত করে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার জন্য।

(৬) আজকাল অনেক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আদানপ্রদান বাড়াতে এবং আর্থনীতিক বিনিময়কে সহজ ও বৃহৎ করে তুলতে চায়। এমন ধারণা মনে পোষণ করা হয় যে এই বহু উদ্দেশ্য-সমন্বিত পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে প্রোপাগান্ডা একমাত্র উপায়। অথবা একমাত্র উপায় না হলেও বিশেষ ফলপ্রদানকারী কৌশল।

প্রোপাগান্ডা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু কল্যাণসাধন করলেও আধুনিককালের বিশ্বপরিস্থিতিকে অতীতের তুলনায় যে একটু বেশিমাত্রায় তিক্ত ও কলুষিত

করে ফেলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নির্বিচার প্রয়োগ প্রোপাগান্ডাকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে গেছে। আর তার ফলে অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে একদিকে যেমন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে তেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচারণার জন্য তিক্ততাও বেড়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের বছরগুলিতে তদানীন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তি তীব্র সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং প্রচারণার যথেচ্ছ ব্যবহার তারা করে। আর এই প্রোপাগান্ডা-হেতুই বিশ্ব-পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রচারণার উদ্দেশ্যে দুই পরাশক্তি নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবন করত।

আজও প্রচারণা নানাভাবে সক্রিয়। বিশেষ করে নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের মধ্যাহ্নকালীন অবস্থায় বৃহৎশক্তি ও তাদের অনুগত বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কবজার মধ্যে আনতে উদ্যত। অথবা বলা যেতে পারে অনেকখানি এনেও ফেলেছে। আর এর পেছনে প্রোপাগান্ডার অবদান অনস্বীকার্য। বাজার অর্থনীতি, তীব্র ভোগবাদ উদারনীতিবাদের জয়গান, সমাজবাদের কুফল ইত্যাদি বিষয়ে জনমতকে অবহিত করতে হলে প্রোপাগান্ডা ছাড়া উপায় নেই। আবার উৎপাদিত ভোগ্যবস্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভোক্তার কাছে উপস্থিত করতে হলে প্রচারণার সাহায্য অপরিহার্য। এসব কারণে আমরা মনে করি সাম্প্রতিক বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় বিষয়ের জন্য প্রয়োজন প্রচারণার।

প্রচারণা ও বিদেশনীতি

প্রচারণা বিদেশনীতির একটি শক্তিশালী অস্ত্র

প্রচারণাকে বিদেশনীতির একটি শক্তিশালী অস্ত্র বলে গণ্য করা হয়। অন্যতম কারণ হল অতীতে শাসনব্যবস্থার শীর্ষ আসনে উপবিষ্ট ব্যক্তিরাই বিদেশনীতি স্থির করতেন এবং রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত তাঁদেরই অনুগত ব্যক্তিবর্গের হাতে এবং সাধারণ মানুষের বক্তব্যের স্থান ছিল না। কিন্তু গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে বিদেশনীতির ওপর জনমতের প্রভাব পড়তে শুরু করে এবং সেইসঙ্গে জনমতকে বিদেশনীতির অন্যতম নিয়ামকের আসনে বসাবার তোড়জোড় বিশ্বের নানাপ্রান্তে শুরু হয়ে যায় এবং সেখান থেকেই জন্ম নিল বিদেশনীতির সঙ্গে প্রোপাগান্ডার সম্পর্ক। ফলে অনেকে ভাবতে শুরু করলেন যে জনমত, বিদেশনীতি ও প্রচারণা একই বলয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে নিজেদের মধ্যে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তবতা বিতর্কিত হয়ে ওঠেনি এই কারণে যে জনমতকে কেউ অপ্রয়োজনীয় এবং প্রভাবহীন উপাদান হিসেবে মনে করেননি। বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা গেল যে একাধিক উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রিক কাঠামোকে সরকার বিদেশনীতির প্রস্তুতি কাজে জনমতকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। বিদেশনীতির বিরুদ্ধে যদি ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে, তখন সরকার তার সংশোধন বা পরিবর্তনের কথা ভাবে।

বড়ো বড়ো রাষ্ট্র বিদেশনীতির ওপর জনমতের প্রভাব যাচাই করার নানাবিধ কৌশল প্রয়োগের সুযোগ পেলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সেইসমস্ত সুযোগ থাকে না বা পায় না। কিন্তু তাই বলে তারা জনমত থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় না। যেমন দূতাবাস ও বিদেশদপ্তর জনসংযোগ বিভাগ Press attaches ইত্যাদি তৈরি করে জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য। এগুলির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের তোলা প্রশ্নের উত্তর দেন অথবা নিজের অবস্থান ও বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থাপিত করেন। উদ্দেশ্য হল জনসংযোগের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত এজেন্সিগুলির একটি অনুকূল ভাবমূর্তি তৈরি করার চেষ্টা হয়ে থাকে। বিদেশনীতির ওপর জনমতের প্রভাব অস্বীকৃত অবস্থায় থাকলে এই প্রচেষ্টা করা হত না। আর এই কাজে প্রোপাগান্ডাকে তৎপর হতে দেখা যায়। প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে অন্যদেশের সরকার কী করতে চায় এবং সেই করার পেছনে কী কী কারণ নিহিত আছে। প্রচারণার মাধ্যমে জনগণ ওয়াকিবহাল হবার সুযোগ পায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রোপাগান্ডা হল একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। বুদ্ধি, চেতনা ও যুক্তির উন্মেষ ঘটানো হল এর অন্যতম কাজ। আর এই উন্মেষের উদয় হলেই মানুষ অতীতের ভাবনা ও চিন্তাকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পায়। মনের পুনর্গঠনে প্রচারণার ইতিবাচক ভূমিকা আজকের দিনে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণমাধ্যমগুলি সমস্ত বিশ্বের রাজনীতিক হালহকিকত মানুষের চোখের ও মনের সামনে এমনভাবে তুলে ধরছে যে সে ইচ্ছা করলেও নিজেকে নির্লিপ্ত করতে পারছে না। প্রচারণার সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধকে উস্‌কে দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রচারক চায় যে জনগণ সরকারের ওপর গণতান্ত্রিক উপায়ে চাপ সৃষ্টি করুক। তা ছাড়া বর্তমানে ব্যক্তি তো রাজনীতির একজন অন্যতম কারক হয়ে উঠেছে। প্রচারণা এই দিকটি আদৌ অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে চায় না।

বিদেশনীতির ওপর প্রচারণার প্রভাব বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন যে বিচ্ছিন্ন জনগণের মধ্যে প্রচারণা সব-সময় সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তাই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংস্থার মাধ্যমে প্রচারণা প্রভাব স্থাপনের দিকে অগ্রসর হয় এবং দেখা গিয়েছে যে প্রচারণা অনেকখানি সাফল্য দেখাতে

পেরেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বহুরকম সংস্থা এবং প্রচারক সেগুলিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে। তা ছাড়া এই সমস্ত সংগঠন অনেকসময় ফিড ব্যাক-এর (feed back) কাজ করে। যেমন প্রচারক যেসমস্ত ইস্যু প্রচার করল জনগণের মধ্যে তার প্রভাব কী দাঁড়াল তাও এই সংগঠনগুলির মাধ্যমে প্রচারক জানার সুযোগ পায়। প্রচারকের জানতে বাকি নেই যে সংগঠনগুলি জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে প্রচারণা গোষ্ঠীভুক্ত জনগণ ও বিচ্ছিন্ন জনগণ উভয়ের মধ্যে প্রচার কাজ চালায়।

সম্পর্ককে অতিরঞ্জিত করা ঠিক নয়

প্রচারবিদের বা প্রচারকের মুখ্য কাজ হল প্রচারের সাহায্যে 'টার্গেট' এলাকার জনগণ যে মত পোষণ করে তাকে অপসারিত করে বা মতাদর্শের প্রতি আনুগত্যে শিথিলতা এনে নিজের মত সেখানে উপস্থাপিত করা। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ প্রচারণার এ সম্পর্কিত সাফল্য বিষয়ে সন্দেহাতীত নন। প্রচারকের আবেদন বা প্রচার কী পরিমাণে সফল হতে পেরেছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সঠিক মতামত ব্যক্ত করতে পারেনি। হোলস্টি বলেন : It is difficult to generalise about the conditions under which propaganda appeals will succeed. (পৃ. ১৭২) হোলস্টির এই মূল্যায়ন মেনে নিলে আমাদের বলতে হয় বিদেশনীতির কোনো পর্যায়ে প্রচারণা তেমন কোনো লক্ষণীয় প্রভাব ফেলতে পারেনি। হোলস্টি এমন কথা বলেননি যে প্রচারণার অবদান নেই। তবে তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা হল এর অবদানকে বেশি করে অতিরঞ্জিত করা যুক্তিসংগত কাজ হবে না।

প্রচারক প্রচারণার কাজে যেসব কৌশল প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে অন্যতম হল পুস্তিকা ছাপিয়ে বিলি করা, বৈদ্যুতিন ও অন্যান্য মাধ্যমকে ব্যবহার, জনগণের মধ্যে প্রচার চালানো ইত্যাদি। কিন্তু বহু অভিজ্ঞব্যক্তি বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 'টার্গেট' এলাকার জনগণ সবসময় যথাযথ গুরুত্বসহকারে প্রবন্ধ বা প্রচারপুস্তিকা পড়ে না বা বিবৃতি শোনে না। সুতরাং এসবই বিফলে যায়। হোলস্টি বলেছেন যে স্নায়ুযুদ্ধের সময় ১৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক রুশ নাগরিক ভয়েস অফ আমেরিকার খবর শুনত। বি.বি.সি.র (BBC) শ্রোতার সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রোতারা খবর শুনে মতামত তৈরি করবে এমন আশ্বাসবাণী কেউ শোনাতে পারেনি (The BBC has probably among the world's largest audience. Even so, objective information does not necessarily lead to any political action, forming or changing attitudes is at best a difficult task, p. 173)।

প্রচারণাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য প্রচারকরা নিত্যনতুন উন্নতমানের প্রযুক্তির সাহায্য নেয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিপক্ষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সেই প্রচারণাকে প্রতিহত বা নিষ্ক্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে পালটা ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। প্রচারণা শেষপর্যন্ত বাগ্‌যুদ্ধে পরিণত হয়। কমবেশি প্রায় সব রাষ্ট্রই হয় পরোক্ষে নতুবা প্রত্যক্ষে বৈদ্যুতিনমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে এবং এর ফলে এক দেশের সংবাদ বা বিবৃতি অন্য দেশের বৈদ্যুতিন-মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারে ব্যর্থ হয়। হোলস্টি বলেছেন (পৃ. ১৭৪) আমেরিকার টিভি কর্মসূচির মাত্র ২ শতাংশ বিদেশি সংবাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়। অন্যান্য দেশে অবশ্য অনেক বেশি। তাই যদি হয় তাহলে মার্কিন নাগরিকগণ বিদেশের রাজনীতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রায় অন্ধকারে থেকেই যায়। আর এই পরিস্থিতিতে আমরা এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে প্রচারণা বিদেশনীতিকে ইচ্ছামতো বা লক্ষণীয়ভাবে পরিচালিত করে।

ওপরের আলোচনা মাথায় রেখে আমরা এই উপসংহার টানব যে প্রচারণার সঙ্গে বিদেশনীতির সম্পর্ক কোনো কোনো স্থলে অতিরঞ্জিত হলেও উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দেওয়ার সময় আজও আসেনি। বৃহৎশক্তির বিদেশদপ্তরের নীতি-নির্ধারকগণ, কূটনীতিবিদেরা ও অন্যান্য ধুরন্ধর ব্যক্তিবর্গ নানাভাবে প্রচারণাকে কাজে লাগাতে তৎপর। বিশেষ করে যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রচারণার ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যায়। শতাংশের হিসেবে হয়তো খুব কম লোক প্রচারণার খপ্পরে পড়ে। এটুকু প্রাপ্তি অস্বীকার করি কেমন করে। আর বিজ্ঞজনেরা যে হিসেবনিকেশ করুন না কেন উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক আছে এবং থাকবে। তবে দিনের পর দিন প্রচারকরা কৌশল বদলে ফেলছে এবং এই কাজ চলতে থাকবে।

(৩) সামরিক উপায়

বিদেশনীতির কৌশল হিসেবে সামরিক উপায়

আমরা বিগত আলোচনায় বিদেশনীতির কৌশল হিসেবে প্রচারণা ও কূটনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কিন্তু লক্ষ করা গেছে যে বিদেশনীতিকে কার্যকর করে তোলার কাজে আরও কয়েকটি কৌশল রাষ্ট্র ব্যবহার করে এবং এদের মধ্যে অন্যতম হল সামরিক উপায় বা সামরিক হস্তক্ষেপ। লক্ষ করার বিষয় হল সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বা সামরিক উপায়ে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাজনীতিক বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যখন হস্তক্ষেপ করে তখন ধরে নিতে হবে যে হস্তক্ষেপকারী রাষ্ট্রের সামরিক সামর্থ্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। অর্থাৎ সামরিক ক্ষমতা বেশি না হলে কোনো রাষ্ট্র

হস্তক্ষেপ করার সাহস দেখাবে না। সামরিক ক্ষমতাকে মূলধন করে অন্য রাষ্ট্রের নীতি, রাজনীতি বা কাজকর্মকে প্রভাবিত করার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া আজকের দিনের ঘটনা নয়। অতি প্রাচীনকালেও এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের কাজকর্মকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হত না। আর এই জাতীয় ঘটনা আকছার ঘটত। তারপর একাধিক কারণে বিদেশনীতির রূপায়ণে সামরিক শক্তির প্রয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বিগত এক শতকের অধিককাল সময়ে শক্তি (সামরিক অর্থে) বিদেশনীতির অন্যতম নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণগুলির দু-একটি উল্লেখ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করে। গণপ্রচার মাধ্যমগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাবনীয় সাফল্য, আর্থনীতিক ও অপরাপর বিকাশ-জাত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সন্নিকটবর্তী হতে সাহায্য করেছে। আর এইসমস্ত উপাদানকে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ বলে অনেকে উল্লেখ করতে চান। (এই প্রসঙ্গে হোলস্টির মন্তব্য পৃ. ২০৪, স্মরণ করা যেতে পারে) কিন্তু সামরিক হস্তক্ষেপের সাহায্যে বিদেশনীতিকে বাস্তবায়িত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ হল মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাষ্ট্রের সামরিক সামর্থ্য গরিষ্ঠসংখ্যক রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি হওয়া এবং যাদের সামরিক শক্তি বেশি তারা 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অনুযায়ী অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতে অগ্রসর হয়। সামরিক হস্তক্ষেপের আর-একটি কারণ হল কোনো কোনো রাষ্ট্র যেনতেনপ্রকারেণ জাতীয় স্বার্থকে ষোলো আনা সুরক্ষিত করতে চায় এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে তারা সামরিক উপায়কে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়। তেল সম্পদে সমৃদ্ধ পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর যৌথ হানাদারির পেছনে জাতীয় স্বার্থ কাজ করেছে বলে অভিজ্ঞমহলের প্রত্যয়। এই জাতীয় স্বার্থটি হল ইরাকের তেল। ইরাকের তেল না হলে দুটি পুঁজিবাদী দেশের বিকাশের অগ্রগতি থমকে যাবে।

সামরিক উপায়ের প্রকারভেদ ও কৌশল

একটি নির্দিষ্ট প্রথায় এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয় বলে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। কিন্তু প্রকারভেদ যা হোক না কেন হস্তক্ষেপকারী উদ্দেশ্য অর্জনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

পরোক্ষ হস্তক্ষেপ

(১) উত্তরের শিল্পসমৃদ্ধ ও সামরিক-বলে বলীয়ান রাষ্ট্রগুলি দেশের অভ্যন্তরস্থ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে অন্য দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে সেই দেশের বিরোধী শক্তিকে সামরিক সাহায্য দেয়। সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে কমবেশি সব দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তারই সুযোগ হস্তক্ষেপকারী দেশ নেয়। কখনও সামরিক অস্ত্র এবং কখনওবা অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ এইসমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে দেয়। এর ফলে এই পরোক্ষ হস্তক্ষেপের গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

(২) পরোক্ষ হস্তক্ষেপের আর-একটি উপায় হল হস্তক্ষেপকারী দেশ হস্তক্ষেপের শিকার হচ্ছে এমন দেশের অভ্যন্তরে ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, জাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদি ঘটিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হল হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে যে দেশ তার সরকারকে বেকায়দায় ফেলা ও রাজনীতিক অস্থিতিশীলতাকে উসকে দেওয়া বা আমন্ত্রণ জানানো। এর ফলে সরকারের পতন বা উত্থান প্রায়শই ঘটে থাকে।

(৩) সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো বা ঘটাতে সাহায্য করা এই ধরনের কাজ আজকাল হামেশাই ঘটছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এবং পশ্চিম এশিয়ায় যেসমস্ত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং অতীতে ঘটেছিল সেগুলির পেছনে আমেরিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ছিল বলে অভিজ্ঞরা বলে থাকেন।

(৪) বিশ্বের নানাস্থানে গেরিলা যুদ্ধ বা অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। এইসমস্ত কাজের নায়কগণ বিদেশ থেকে সামরিক সাহায্য পেয়ে থাকে। শ্রীলঙ্কার এল.টি.টি.ই. বা পাকিস্তানের আই. এস. আই. বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ সামরিক সাহায্য পায়। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা বলেন যে অন্তর্ঘাতমূলক বা গেরিলা যুদ্ধে নিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা বিদেশ থেকে সাহায্য না পেলে দীর্ঘকাল ধরে কাজ চালিয়ে যেতে এরা পারত না। আই. এস. আই-এর অর্থের উৎস মূলত পাকিস্তান হলেও অন্যান্য দেশ থেকে সাহায্য পায়।

সরাসরি হস্তক্ষেপ

অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বা রাজনীতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ বিশ শতকের রাজনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বলে হোলস্টি মনে করেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে, হোলস্টির হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বের নানা স্থানে প্রায় ২০০টি বিপ্লব হয়েছিল। প্রায় ১০০টি বিপ্লবে বিদেশি শক্তি প্রত্যক্ষভাবে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে সাতের দশকে বারোটি গৃহযুদ্ধ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হয়েছিল। বিশ্বের ৫০টি দেশকে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে (The record of the twentieth century is remarkable. In some 200 revolutions that occurred during the first half of the century some

form of foreign intervention took place in almost half. In approximately fifty of these revolutions, more than one outside power intervened. Soviet Russia, Nazi Germany and Fascist Italy intervened in their neighbour's domestic political life with unprecedented regularity. In a more recent study of twelve civil wars during 1970s Duner counted acts of intervention by fifty different countries. *Holsti*. p. 205-206)। আর-একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে আমেরিকা, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭১টি ক্ষেত্রে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়েছিল এবং সবগুলি হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ দেশের বিদেশনীতিকে এমনভাবে পরিচালিত করা যাতে করে জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ পুরোমাত্রায় সাধিত হয়।

কেবল বৃহৎশক্তিগুলিকে হস্তক্ষেপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত কাজ নয় বলে মনে করা হয়। অন্য রাষ্ট্রের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটাতে ছোটো বা মাঝারি রাষ্ট্রকে দেখা গেছে। বিগত শতকের ছয়ের দশকে মিশর ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিল বলে জানা যায়। লেবাননে সিরিয়া বিশাল সামরিকবাহিনী মোতায়েন করেছে। সৌদি আরব ও রাশিয়াকে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে দেখা গেছে। ইজরায়েল তো হামেশাই সামরিক হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

আমেরিকা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে সামরিক হস্তক্ষেপ করত মূলত দুটি কারণে। এইসমস্ত দেশের সরকারকে নিজের অনুগত করে রাখা যাতে করে সমাজবাদের ঢেউ এসে এদেরকে পুঁজিবাদ ও আমেরিকা-বিরোধী না করে। এবং লাতিন আমেরিকার বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজের শোষণমূলক কর্তৃত্ব কায়েম করা। পশ্চিম এশিয়ার (বা মধ্য প্রাচ্যের) দেশগুলিতে সামরিক হস্তক্ষেপের প্রধান কারণ হল এই অঞ্চলের অফুরন্ত তেল সম্পদকে কুক্ষিগত করা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন হস্তক্ষেপ করত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে মস্কোর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির সরকার স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে কোথাও কমিউনিস্ট সরকারের বিরোধিতা শুরু হলে মস্কো কঠোর মনোভাব অবলম্বন করত এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটত সামরিক হস্তক্ষেপে। হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশে কমিউনিস্ট পার্টির বা মস্কোর কমিউনিস্ট সরকারের হস্তক্ষেপ তারই প্রমাণ।

সামরিক হস্তক্ষেপকে (পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ) কেন্দ্র করে অনেকসময় বিতর্ক দেখা দেয়। হস্তক্ষেপকারী দেশ নানাপ্রকার জটিল প্রশ্ন তুলে বলে যে সে হস্তক্ষেপ করেনি। সেই কারণে কোনো কোনো আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিশারদ সামরিক হস্তক্ষেপের একটি সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। রাজনীতিক নেতার পরিবর্তন বা সাংবিধানিক কাঠামোকে বদলে ফেলার জন্য এক রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য দেয় তখন তাকে সামরিক হস্তক্ষেপ বলে। আর এই কাজ সেই রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে করে (We will use the term intervention to designate any activity that deliberately seeks to change the political leader or the constitutional structure of a foreign political jurisdiction. *Holsti*, p. 208)।

সামরিক হস্তক্ষেপের শর্তাবলি

বিশ্বের নানা স্থানে যদিও আজকাল সামরিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে এবং এটি বিদেশনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তির আসনে আসীন বলে আমরা মনে করি। কতকগুলি অনুকূল পরিবেশ সামরিক হস্তক্ষেপকে আহ্বান জানায়।

প্রথমত, শর্ত হল, জাতীয় জনসমাজ বা জাতিরাষ্ট্রর মধ্যে ভাষা, ধর্ম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নানা জনগোষ্ঠী থাকে এবং তাদের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর বিরোধ সহজাত। নানা কারণে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানায়। অথবা এই গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনীহা জানায়। এই পরিস্থিতিতে উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে মত-পার্থক্য তীব্রতর হতে থাকে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নিজের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলনে নামে এবং প্রয়োজনে বাইরের শক্তির কাছ থেকে সাহায্য চায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীরা প্রতিবেশী ও বাইরের কোনো কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য পাচ্ছে। অর্থাৎ বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য বাইরের সামরিক শক্তি হস্তক্ষেপ করছে। আফগান বিদ্রোহীরা, চিন, পাকিস্তান, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। রোডেসিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পেছনে আফ্রিকার বহু রাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য কাজ করেছিল। উদ্দেশ্য হল বিরোধী বা বিদ্রোহীদের সাহায্য করে নিজের প্রভাব স্থাপন করা (The patron can intervene on behalf of the group, faction or clique and after it gains power use its influence with the group to secure its foreign policy interests. *Holsti*, p. 208)।

দ্বিতীয়ত, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা বা ধর্মীয় গোষ্ঠী অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সংস্থা বা গোষ্ঠীর প্রতি যদি আনুগত্য দেখায় এবং তা যদি ওই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে উদ্যত হয় বা নষ্ট করার মতো পরিবেশ তৈরি করে তখন সামরিক হস্তক্ষেপের অবস্থা দেখা দেয় এবং হস্তক্ষেপ ঘটতেও পারে। এই ধরনের হস্তক্ষেপ বিশ্বের নানা জায়গায়

ঘটেছে এবং ঘটছে। ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে বিভিন্ন দেশের গির্জা আন্তর্জাতিক গির্জা কর্তৃপক্ষের নিকট আনুগত্য প্রদর্শনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগে এবং সপ্তদশ শতকে এই প্রবণতা দেখা যেত। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিকদল একটি বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শের নিকট দায়বদ্ধ থাকে এবং তাকে কেন্দ্র করে সামরিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে বলশেভিক পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সেই দেশে কমিউনিস্ট পার্টি উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে বিশ্বের একাধিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি মস্কোর নেতৃত্ব মেনে নেয়। মস্কোকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেরণাদাতা বলে মনে করে এবং সর্বোপরি বিশ্বের অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নিকট আনুগত্য দেখাতে আরম্ভ করে। ভারতের নকশালপন্থী গোষ্ঠীগুলি চিনের কমিউনিস্ট পার্টিকে তাদের পথপ্রদর্শক বা প্রেরণাদাতা বলে মনে করে। একসময় ভারতের নকশালপন্থীদের স্লোগান ছিল 'চিনের পথ আমাদের পথ' অর্থাৎ যে বৈপ্লবিক পথ অবলম্বন করে চিন জনগণের মুক্তি এনেছে ভারতের নকশালপন্থীরা সেই পথ অনুসরণ করতে চায়। এই প্রবণতা অনেকসময় অন্য রাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপকে উৎসাহিত করে (The characteristic of modern politics creates opportunities for foreign states symbolising these transnational ideologies to become involved in other nations' domestic politics.)।

তৃতীয়ত, পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রের রাজনীতিক কাজকর্মকে নিজের মতো করে তোলার পেছনে অনেক বা অন্যতম বাধা হল বিশ্বজনমত ও রাষ্ট্রসংঘ এই অস্ত্রের ব্যবহার তো অনুমোদন করবেই না উপরন্তু তীব্র বাধাদানের চেষ্টা চালাবে। অথচ সামরিক হস্তক্ষেপের পথ থেকে অনেক রাষ্ট্র সরে আসতে চায় না এবং এই পরিস্থিতিতে অল্পমাত্রায় সামরিক হস্তক্ষেপ করা এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়। এ যেন অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো কাজ। সামরিক হস্তক্ষেপ (সমালোচনা এড়িয়ে) করা হল এবং তার সাহায্যে বিদেশনীতিকে ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হওয়া গেল। একটি রাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা মানে সেই রাষ্ট্রকে পীড়নমূলক উপায়ে বাধ্য করা নিজের মতামতকে জলাঞ্জলি দিয়ে ঘাঁটি স্থাপনকারী রাষ্ট্রের অনুকূলে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই ধরনের কাজ সব রাষ্ট্র করতে পারে না। কেবল যারা অতিবৃহৎ বা পরাশক্তি তারাই অতীতে করত এবং এখনও করে থাকে। যেমন আমেরিকা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের নানা রাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছিল। এখন আমেরিকা এবং আরও দু-একটি দেশ এই কাজ করে চলেছে।

চতুর্থত, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে বিদেশে বৈপ্লবিক সরকার স্থাপনের জন্য অন্য রাষ্ট্র সোৎসাহে এগিয়ে যেত। অথবা একদেশের বৈপ্লবিক দল অন্যদেশের বৈপ্লবিক দলকে সাহায্য করত। এ কাজকে জাতীয় লক্ষ্য বলে তারা মনে করত। এ কাজে সামরিক সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিলে বিপ্লবে বিশ্বাসী রাষ্ট্র গোপনে বা প্রকাশ্যে সামরিক সাহায্য দিত। এই ব্যবস্থা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে সচরাচর দেখা যায়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে এই কাজ করতে দেখা যেত।

পঞ্চমত, এক রাষ্ট্রের বহুসংখ্যক নাগরিক কাজের বা জীবিকার প্রয়োজনে অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করে। অন্য রাষ্ট্রে বসবাসকারী নাগরিকগণ যদি পীড়নমূলক আচরণের শিকার হয় বা তাদের প্রতি বিভেদমূলক আচরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি খ রাষ্ট্রে বাস করে এবং খ-এর সরকার নানা অজুহাতে ক-এর নাগরিকদের ওপর বিভেদমূলক আচরণ চাপিয়ে দেয়, তখন ক বাধ্য হয় খ-এর বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে। ক চায় খ তার সমস্ত ব্যক্তিকে ন্যায়সংগত সুযোগসুবিধা প্রদান করুক। বসবাসকারী ব্যক্তিগণের সুযোগসুবিধাকে কেন্দ্র করে সামরিক হস্তক্ষেপ খুব বেশি না ঘটলেও একে একেবারে একটি বিরল ঘটনা বলে উপেক্ষা করা যায় না।

ষষ্ঠত, ইতিহাসের ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সামরিক হস্তক্ষেপের বাসনা নিয়েই হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই। যেমন একটি বৃহৎ-শক্তির পাশে যদি একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র থাকে তাকে নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলার বাসনায় বৃহৎ রাষ্ট্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর সামরিক আগ্রাসন চালায়। এ সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান চালানো হয়েছে এবং এইসমস্ত অনুসন্ধান বলে যে বিশ শতকে যেসমস্ত সামরিক হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল তার সিংহভাগ ঘটেছিল বড়ো রাষ্ট্র কর্তৃক ছোটো রাষ্ট্রকে গ্রাস করার চেষ্টার মধ্যে। চিন তিব্বতকে গ্রাস করেছিল তার জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে। অথচ তিব্বত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকলে ভারতের দিক থেকে তা লাভজনক হত। আমেরিকা যেসমস্ত সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল তার বেশিরভাগই ছিল অন্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের আধিপত্য স্থাপন করা। যার অন্য নাম তাকে গ্রাস করে ফেলা। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নও এই কাজ করত (Of the fifty-one armed interventions, the United States led with seventeen (33%) of

which all but three took place in Central America and the Carribean. Similarly most Soviet armed interventions were directed not against capitalist states but against contiguous members of the socialist common-wealth. *Holsti*, p. 210)।

ওপরে আমরা যেসমস্ত শর্তের উল্লেখ করলাম সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য শর্ত দেখতে পাওয়া যায় তবে শর্ত থাকলেই সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটবে এমন নিশ্চয়তা নেই। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার আগে মস্কো একাধিকবার অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে বৃহৎশক্তিগুলি আজ মনে করে যে সামরিক হস্তক্ষেপের সাহায্যে বিদেশনীতিকে কার্যকর করে তোলা যেতে পারে এবং যায়ও। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে বলে আমেরিকা মনে করত এবং এখনও করে। মনরো তত্ত্বের (Monroe Doctrine) অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লাতিন আমেরিকা থেকে ইউরোপীয় শক্তিকে অপসারিত করে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপকে নিষ্কণ্টক করে তোলা। একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাশিয়া চেচনিয়া ও জর্জিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে এবং সামরিক অভিযান চালিয়েছে।

সামরিক উপায়ের সীমাবদ্ধতা

বিদেশনীতির বাস্তবায়নে সামরিক উপায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এর স্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত সীমাবদ্ধতাগুলি কোনো চিন্তাশীল পাঠক অথবা অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উনিশ শতকে অথবা বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত বৃহৎশক্তিবর্গ বেপরোয়াভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করত নিজ নিজ দেশের বিদেশনীতির কাঙ্ক্ষিত বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাটার টান লক্ষ করা যায়। এই ক্রমহ্রাসমান অবস্থার পেছনে যে কারণটি অতিমাত্রায় সক্রিয় তা হল এর সীমাবদ্ধতা। সীমাবদ্ধতাগুলি পরে এভাবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

(১) **সন্ত্রাস সাম্যের আবির্ভাব।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অল্প মাত্রায় হলেও সন্ত্রাস সাম্য বা balance of terror জন্মলাভ করে। প্রথমে আমেরিকা বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত করে এবং তারপরেই তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অস্ত্রের নির্মাতা হয়। ফলে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রের একচেটিয়া মালিকানা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্র প্রস্তুত শুরু করে দেওয়ায় ওয়াশিংটনের অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ মস্কো পালটা হুমকি দিয়ে বলে যে আমেরিকা অস্ত্র প্রয়োগ করলে সেও একই পথ অনুসরণ করতে বাধ্য হবে এবং এই পালটা হুমকি আমেরিকাকে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ থেকে বিরত করে। একেই বলা হয় (অতি সাধারণ ভাষায়) সন্ত্রাসসাম্য। আস্তে আস্তে সন্ত্রাসসাম্য দুই পরাশক্তির প্রভাবাধীন এলাকা থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। তবে দুই পরাশক্তির সম্পর্কের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সন্ত্রাসসাম্য। মস্কো পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিলে ওয়াশিংটন পালটা হুমকি দিত। এভাবে সন্ত্রাসসাম্য সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে অনেকখানি কমিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।

(২) **পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় বিশ্বের পাশে দাঁড়ানোয় সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছিল।** গত শতকের পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি এক এক করে স্বাধীন হতে শুরু করে। এদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পেছনে যেসমস্ত দেশ দাঁড়িয়েছিল বা মুক্তি আন্দোলনকে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন জানিয়েছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য হল তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, চিন ইত্যাদি। মস্কো ও চিন তৃতীয় বিশ্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নেয় এবং ভারত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে জোটনিরপেক্ষ করে তোলার বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে যা নির্জোট আন্দোলন নামে পরিচিত। এই তিন রাষ্ট্রের (অপরাপর রাষ্ট্রেরও নানাপ্রকার ভূমিকা অবশ্যই ছিল) গঠনমূলক ভূমিকার জন্য আমেরিকা ও অন্যান্য যুদ্ধবাজ দেশ সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যসিদ্ধির পথ থেকে সরে আসে। অর্থাৎ সামরিক উপায়কে এরা নিশ্চিত ফলোৎপাদনকারী উপায় হিসেবে গণ্য করতে রাজি হয়নি।

(৩) **কেবল সন্ত্রাসসাম্য সামরিক উপায়কে ভোঁতা করে দেয়নি, শক্তিসাম্যও অংশত দায়ী।** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, বিশ্বে অন্তত কিছু পরিমাণে শক্তিসাম্য দেখা দিয়েছিল। ওয়াশিংটনের পালটা শক্তি হিসেবে মস্কো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের নেতৃত্বে নির্জোট আন্দোলনগোষ্ঠী-রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। নানাভাবে বিশ্বরাজনীতিতে একপ্রকার শক্তিসাম্য দেখা দেওয়ায় কোনো মহাশক্তিধর অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে ভয় পেত।

(৪) **বিশ্বজনমত সামরিক হস্তক্ষেপকে বরদাস্ত করতে পারেনি।** অনেকে মনে করেন যে সামরিক কৌশলে বিদেশনীতিকে কার্যকর করার প্রচেষ্টাকে বিশ্বজনমত মেনে নিতে পারেনি বলে এই কৌশলের ধার বেশ কমে গিয়েছিল।

কারণ দুটি বিশ্বযুদ্ধ থেকে আপামর জনসাধারণ বুঝে গিয়েছিল যে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ কী হতে পারে? সুতরাং যুদ্ধের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা দিলেই বিশ্বজনমত তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠত এবং অস্ত্র প্রয়োগকারী রাষ্ট্র বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করার সাহস দেখাতে চাইত না। তাই বলে বিশ্বের কোথাও যে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেনি তা নয়। তবে পণ্ডিতদের অনুমান যে বিশ্বজনমত বিরোধিতা না করলে আরও অনেক বেশি সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটত। কারণ উনিশ শতকে সামরিক হস্তক্ষেপের অনুকূলে যেসমস্ত উপাদান ছিল বিশ শতকে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যেমন প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে উন্নতমানের অস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। অস্ত্রোৎপাদনকারীরা সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিল তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেনার জন্য ইত্যাদি। ২০০২-৩ এ ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ হস্তক্ষেপ বিশ্বজনমত মেনে নেয়নি। খোদ আমেরিকায় এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল এবং বুশ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। ২০০৮-এর নভেম্বরে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ের একটি কারণ হল ইরাকে মার্কিন হস্তক্ষেপ।

(৫) রাষ্ট্রসংঘের আবির্ভাব সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস করেছে। সনদের মধ্যে উল্লেখ আছে যে রাষ্ট্র বিরোধ মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করবে ও অস্ত্র প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে। অস্ত্র প্রয়োগের সাহায্যে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলে রাষ্ট্রসংঘের তরফে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত সদস্য এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করে। রাষ্ট্র সামরিক পদক্ষেপের সাহায্যে জাতীয় স্বার্থরক্ষায় উদ্যত হলে সেই রাষ্ট্রকে সনদ লঙ্ঘনকারী বলে মনে করা হবে এবং সনদের বিধান অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থা নেবে।

(৬) বহু রাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপকে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের অথবা বিদেশনীতিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী হাতিয়ার হিসেবে মনে করে না। কারণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, পারস্পরিক আলোচনা বা অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে অধিক পরিমাণে বিদেশনীতিকে কার্যকর করে তোলা যায়। তদুপরি যে রাষ্ট্র অস্ত্র প্রয়োগকে মোক্ষম উপায় বলে মনে করে আন্তর্জাতিক সমাজে সে ধিক্কারের বস্তুতে পরিণত হয়। নানা রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে সামরিক অস্ত্রপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। উত্তরের শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি অতীতের সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পথ থেকে সরে এসেছে। আর এর ফলে অস্ত্রপ্রয়োগের প্রবণতাও কমতে শুরু করেছে। অবশ্য প্রভাব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা কমেনি। অন্য উপায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থ-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় রত।

উপসংহার

বিদেশনীতির উপায় হিসেবে সামরিক হস্তক্ষেপ পুরোপুরি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে অথবা রাষ্ট্রগুলি একে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে এমন কথা বলা চলে না কারণ বলার সময় আসেনি। আজও বিশ্বের নানা প্রান্তে সামরিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। গত শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত আমেরিকা লাতিন আমেরিকার নানা দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করত এবং তার প্রধান কারণ ছিল কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ ঠেকানো। সোভিয়েত তথা সাম্যবাদী দুর্গের পতনের পর কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞ থেকে আমেরিকা আজ সরে এসেছে। কমিউনিস্ট দেশ চিনের সঙ্গে আমেরিকা বাণিজ্যিক ও কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করায় আমেরিকার সামরিক প্রস্তুতি স্তিমিত আকার নিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটায় মস্কোর সামরিক তৎপরতা অনুপস্থিত।

কিন্তু আজও পশ্চিম এশিয়ার তেল সম্পদের ওপর পুঁজিবাদী দেশগুলির লোলুপদৃষ্টি বিদ্যমান। ২০০২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত আমেরিকা ইরাকের ওপর সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ-সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ইরাকের ওপর সামরিক শক্তি প্রয়োগের যে কারণ আমেরিকা দেখাক না কেন আসল কারণ যে তার জাতীয় স্বার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমেছে। কিন্তু খিড়কির দরজা দিয়ে আমেরিকা যে সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটিয়ে চলেছে সে বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা একমত। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলির মাধ্যমে পুঁজিবাদী দেশগুলির বৃহদায়তন অস্ত্রোৎপাদনকারী সংস্থা সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য। কারণ তাদের অস্ত্রভাণ্ডার খালি করা একান্ত প্রয়োজন। আর এই পরিস্থিতিতে সামরিক কৌশল অনিবার্য হয়ে উঠছে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতেও সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটছে। আর তার পেছনে কাজ করছে ধর্মীয় উন্মাদনা ও আধিপত্য স্থাপনের উদগ্র বাসনা। অতএব বলা যেতে পারে সামরিক হস্তক্ষেপের উপাদান যতদিন থাকবে এর অস্তিত্ব কেউ বিলুপ্ত করতে পারবে না।

(৪) বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

বৈদেশিক সাহায্য হল আর-এক প্রকার কৌশল যা এক দেশ তার বিদেশনীতিকে কার্যকর করার কাজে প্রয়োগ করে। সাধারণ ভাষায় বৈদেশিক সাহায্য বলতে আমরা বুঝি সেই

প্রকার সাহায্য যা এক দেশ অন্য দেশকে দিয়ে থাকে। তবে এই সংজ্ঞা অপ্রতুল। বৈদেশিক সাহায্য হল অর্থ, পণ্যসামগ্রী, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কৌশল, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ইত্যাদির এক দেশ থেকে অন্য দেশে হস্তান্তর। কেউ কেউ আবার একে আর্থনীতিক রাষ্ট্রশাসন কাজের একটি কৌশল হিসেবে গণ্য করেছেন। এই কৌশলটি নানাপ্রকার সাহায্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (A technique of economic state craft where aid is used as an instrument of policy in order to achieve certain goals. Foreign aid implies a relationship between two actors which may be stipulated on the one hand as donor and on the other hand as recipient. *Penguin Dictionary of International Relations)*।

ওপরে প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যেমন বৈদেশিক সাহায্য নানাপ্রকার হতে পারে। এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সাহায্য দিতে পারে। আবার প্রাযুক্তিক পরামর্শ-দানও বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে পড়ে। বৈদেশিক সাহায্যের জন্য দরকার দুই বা ততোধিক কারকের। একজন সাহায্য দেবে এবং অন্যেরা তা নেবে। প্রথম জনকে বলে 'দাতা' এবং দ্বিতীয় জনকে বলে 'গ্রহীতা'। অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল একজনের দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে এবং সে যা দিচ্ছে তা অন্য একজনের গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এক রাষ্ট্রের আর্থিক সামর্থ্য অন্য রাষ্ট্রের বিকাশ বা অন্য নানাপ্রকার প্রয়োজনে নিয়োজিত হচ্ছে বা হবে। আবার দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে আর-একটি সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। দাতা যা দিচ্ছে গ্রহীতা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক গড়ে ওঠে যাকে আমরা বলি আদানপ্রদান বিষয়ক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক থেকেই জন্ম নেয় রাজনীতিক আর্থনীতিক, বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সাহায্য প্রদানের মাধ্যমেই দাতা তার নীতি বা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয়।

বিদেশনীতির একটি কৌশল

আবির্ভাব

অতীতের বিদেশনীতির কৌশল হিসেবে কূটনীতি বা সামরিক কৌশলের বিশেষ স্থান থাকলেও বৈদেশিক সাহায্যের বিশেষ স্থান ছিল না। বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীর মনের ওপর প্রভাব স্থাপনের নিমিত্ত কিছু কিছু সাহায্য করত অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। কিন্তু নিজ রাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে বাস্তবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে অন্যান্য রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়া নামক কাজটির জন্ম বিশ শতকের প্রায় গোড়ায় যখন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যাহ্নকালীন অবস্থা। এশিয়া ও আফ্রিকায় অবস্থিত উপনিবেশগুলির আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্রিটিশ সরকার নানা পরিকল্পনা নিত যেগুলির মুখ্য লক্ষ্য ছিল আর্থব্যবস্থাকে (উপনিবেশগুলির) এমন পর্যায়ে উন্নীত করা যার ফলে উপনিবেশের জনগণের আর্থিক ও অন্যান্য বিকাশ ঘটে এবং সেইসঙ্গে ব্রিটেনেরও উন্নতি হয়।

ব্রিটিশ সরকার এ কাজ করত নিছক মানবিকতা বোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নয়, উপনিবেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ঔপনিবেশিক সরকারকে যখন নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল এবং আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ সরকারের পিঠ দেয়ালে ঠেকেছিল তখন বাধ্য হয়ে এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি পাকাপোক্ত করে তোলা এবং একইসঙ্গে আন্দোলনকারীগণের আন্দোলনের তীব্রতা স্তিমিত করে দেওয়া। এই প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বাঁচার তাগিদে বা সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ জিইয়ে রাখার প্রয়োজনে বৈদেশিক সাহায্যকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটেনের দেখাদেখি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও বৈদেশিক সাহায্যকে বিদেশনীতির কৌশল হিসেবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে শুরু করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের আর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল এবং মূলত সেই কারণে দরাজহাতে রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য দিয়ে তাদের আনুগত্য কিনে নিতে পারেনি। বলা যেতে পারে যে তার শিরেসংক্রান্তি। এই সুযোগ নিয়েছিল আমেরিকা। লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার জন্য ওয়াশিংটন যে বিদেশনীতি প্রস্তুত করত তার সঠিক রূপায়ণের জন্য সে বৈদেশিক সাহায্যকে অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিল। বিশ শতকের প্রায় প্রথম দশক থেকে আমেরিকা অতীতের নিঃসঙ্গবাদ নীতিকে বর্জন করে বিশ্বরাজনীতির অন্যতম কারক হয়ে ওঠার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিল এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে চার মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির শাসকগোষ্ঠীকে নিজের অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা চালায়।

বৈদেশিক সাহায্যকে বিদেশনীতির কৌশল হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে অন্য কারণও ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হলে যে রেস্ত দরকার তা তদানীন্তন বিশ্বে আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের ছিল না। নানাপ্রকার পরিকল্পনার সাহায্য আমেরিকা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশকে সাহায্য দিতে আরম্ভ করে। মার্কিন বিদেশনীতি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে 'জনপ্রিয়তা' অর্জন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শগত ও সামরিক সম্প্রসারণ রোধ করার প্রয়োজনীয়তাও আমেরিকা অনুভব করে এবং তা করতে হলে আর্থিক সাহায্য অপরিহার্য। মস্কো যেসমস্ত দেশে কমিউনিজমের ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে অথবা তৈরি করে ফেলেছে তাকে প্রতিহত করতেই হবে। অন্যদিকে আমেরিকা চুপ করে বসে থাকেনি। স্নায়ুযুদ্ধের বছরগুলিতে তদানীন্তন বিশ্বের দুই পরাশক্তি এশিয়া ও আফ্রিকায় সাহায্যদানের জন্য নানা পরিকল্পনা নেয় এবং সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি ও পরামর্শদান সাহায্য দিতে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগ্রাসন রোধ করা বা অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা-বাদীদের সঙ্গে সংঘাতের মোকাবিলা করার জন্য সামরিক সাহায্য দিতে মস্কো বা ওয়াশিংটন কসুর করেনি। এভাবে বৈদেশিক সাহায্য বিদেশনীতির এক প্রভাবশালী হাতিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিদেশনীতির একটি হাতিয়ার হিসেবে বৈদেশিক সাহায্যের আবির্ভাবকে সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তর-দায় (legacy) হল উপনিবেশগুলির সকলক্ষেত্রের পশ্চাৎপদতা। তার করালগ্রাস থেকে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিকে মুক্ত করার জন্য বিদেশের সাহায্য কার্যত অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং সাবেক উপনিবেশগুলি সাহায্যের জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকে। অসংখ্য চাপের মধ্যে পড়ে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু সাহায্যদান শর্তহীন থাকেনি। সাহায্য-দানের সঙ্গে সাহায্যগ্রহণকারী রাষ্ট্রের বিদেশনীতিকে পরিচালিত কারার মৌরসিপাট্টা পেয়ে যায়।

বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য

এক রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রকে আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সাহায্য দেয় তখন তার মধ্যে এই চিন্তা প্রাধান্য পায় যে সাহায্য-গ্রহণকারী দেশ তার প্রতি নানা ব্যাপারে আনুগত্য দেখাবে। সাহায্য প্রদানকারী দেশের বৈদেশিক নীতির বিরোধিতা তো করবেই না, উপরন্তু তাকে বাস্তবায়িত করে তোলার ব্যাপারে সর্ববিধ সাহায্য করবে। বিদেশনীতি রূপায়ণে রাষ্ট্র যদি বাধার মুখে উপস্থিত হয় তাহলে একদিকে তা জটিলতার জন্ম দেয় এবং অন্য দিকে জাতীয় স্বার্থ বিপদের মুখে দাঁড়ায়। তাই অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে আনুগত্য আদায়ের জন্য বৈদেশিক সাহায্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন উন্নয়নশীল দেশের দ্রুত আর্থনীতিক বিকাশকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সচ্ছল রাষ্ট্র সাহায্য দেয়। এই পরিস্থিতি আমরা লক্ষ করছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি সুদীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার দরুন সবরকম বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল এবং স্বাধীনতালাভের পর এই দেশগুলি বিকাশের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে সাহায্য পাওয়ার তাগিদ অনুভব করে। একাধিক রাষ্ট্র দ্রুত উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়।

ওপরের কারণ ছাড়া দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা, ব্যাপক অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, রাজনীতিক স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিতকরণ, সামাজিক বৈষম্যের বিলোপসাধন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং সম্পদশালী রাষ্ট্র জাতীয় সম্পদের একটি অংশ বিদেশের বিকাশসাধনে ব্যয় করে।

অনেকের ধারণা যে বিশ্বে বর্তমানে যে নানাপ্রকার অশান্তি তার মূল কারণ হল জাতিতে জাতিতে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য। সবল ও সম্পদশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালাতে উৎসাহী। সুতরাং সমস্ত দেশ থেকে যদি দারিদ্র্য বিলুপ্ত করে ফেলা যায় তাহলে সবল জাতির মধ্যে এই প্রবণতা থাকবে না। সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য বৈদেশিক সাহায্যকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। কারণ দরিদ্র রাষ্ট্রগুলি সম্পদের অভাবহেতু বিকাশের লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারছে না এবং সেই কারণে দরকার বিদেশের সাহায্য। রাষ্ট্রসংঘের সনদের মধ্যে সাহায্য প্রদানকে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে, এবং সেখানে সাহায্য কথাটি অনুপস্থিত। সনদের নানা স্থানে আর্থনীতিক সহযোগিতা (economic cooperation) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। সনদ বলতে চায় যে আর্থনীতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

কেবল দারিদ্র্য থেকে মুক্তি নয়। বিশ্বে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাও বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্য। কারণ বিশ্বের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা বা নিরক্ষরতা, ব্যাধি ইত্যাদির শিকার হয়ে থাকলে সামগ্রিকভাবে ন্যায়বিচার অবহেলিত থাকবে। অতএব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেও দরকার বিদেশের সাহায্য, অনেকে এমন কথাও বলেন যে সম্পদশালী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দিতে বাধ্য এই কারণে যে তাদের সম্পদের পেছনে আছে তৃতীয় বিশ্বের শোষণ। অতীতে উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলি দক্ষিণের দেশগুলিকে নানাভাবে শোষণ করেছিল আর সেই শোষণের জন্যেই তারা আজ নানাদিক থেকে পশ্চাৎপদ।

মূল্যায়ন

বৈদেশিক সাহায্যের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন বাস্তবে এই মহত্ত্বের ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

কারণ সম্পদশালী রাষ্ট্র যখন সাহায্য দেয় তখন সেই সাহায্যের সঙ্গে এমন শর্ত আরোপ করে যা সাহায্যগ্রহণকারী দেশের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হয়ে দাঁড়ায়। অথচ শর্তহীন সাহায্য প্রায়ই দেখা যায় না। সমালোচকগণ মনে করেন যে শর্তাধীন সাহায্য ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সবসময় সাহায্য করে না। বহু রাষ্ট্র এই শর্তাধীন সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছুক। ফলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন দেশগুলি বিকাশের লক্ষ্যে উপস্থিত হতে পারছে না।

সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে যে কেবল শর্ত আরোপ করা হয় তা নয়, নানাপ্রকার বৈষম্য করাও হয়। যেমন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন যেসমস্ত সাহায্য দিত সেই সাহায্যের প্রায় সবটাই যেত তার অনুগত বা গোষ্ঠীভুক্ত এবং তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে। অর্থাৎ এই দুই গোষ্ঠীর বাইরে অন্যান্য দেশ সোভিয়েত সাহায্যলাভে মোটামুটি বঞ্চিত ছিল। এই জাতীয় বৈষম্য একেবারেই কাম্য নয় বলে সমালোচকগণ মনে করেন। আমেরিকা যে সাহায্য দেয় তার অবস্থাও একইরকম। ওয়াশিংটনের সাহায্য সেইসমস্ত দেশে যায় যারা বন্ধু বা জোটের সদস্য। সবসময় অভাবী রাষ্ট্রগুলির কাছে সাহায্য গিয়ে পৌঁছয় না। যেমন আমেরিকা ইজরায়েলকে বিপুল সাহায্য দিয়েছে যদিও সে উন্নয়নশীল দেশ নয় এবং তার সাহায্যের তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। আমেরিকার সাহায্য পেয়েছে মিশর ও তুরস্ক। অবশ্য কোনো কোনো রাষ্ট্র সাহায্য করেছে প্রয়োজনের কথা ভেবে। কিন্তু দাতা হিসেবে তাদের তেমন নামডাক নেই (Statistics on aid discrimination in the 1980s reveal clearly that need as a criterion of aid ranks significantly behind political and strategic consideration, at least this is the case for the major powers. *Holsti*, p. 196)।

সাহায্যগ্রহণকারী দেশ যদি কৃতজ্ঞতা বোধে গদগদ চিত্তে আনুগত্য প্রদর্শন না করে তাহলে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেওয়ার ষোলো আনা সম্ভাবনা। দাতা এই আনুগত্য প্রত্যাশা করে বলেই বৈদেশিক সাহায্য সবসময় নির্ভেজাল হতে পারেনি। সাহায্যের মাধ্যমে শক্তিমান দেশ আন্তর্জাতিক সমাজে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে ও অন্যদেশের বিদেশনীতিকে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চায় এবং মূলত সেই কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতি প্রায়শই উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। বিদেশি সাহায্যকে শর্তহীন করার কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হল দাতা যদি এ ব্যাপারে আগ্রহী না হয় তাহলে করার কিছু নেই। বৈদেশিক সাহায্যকে বিদেশনীতির একটি অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বোধকরি আমেরিকা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে এবং তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইজরায়েল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি আমেরিকা ইজরায়েলকে সামরিক, আর্থিক ও অন্যান্য নানাপ্রকার সাহায্য দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতে দেবে। সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে আমেরিকা ইজরায়েলকে তার কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং কার্যত ইজরায়েল হল পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার প্রভাব বিস্তারের অন্যতম ঘাঁটি। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। সামরিক সাহায্য আমেরিকার কাছ থেকে পেয়ে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য আজকাল বিদেশি সাহায্যের প্রকৃতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যেমন পুঁজি ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করাও বিদেশি সাহায্যের মধ্যে পড়ে। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের দ্রুত বিকাশের যুগে বিদেশ-নীতিতে পুঁজি ও প্রযুক্তি নতুন ভূমিকা পালন করছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি উন্নতদেশের কাছ থেকে বিকাশের লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করছে যদিও আমদানিকারক দেশগুলি বিনিময়ে অনেক দিতে বাধ্য হচ্ছে তবুও উন্নত দেশগুলি একে সাহায্য বলে প্রচার চালাচ্ছে।

উপসংহার

বিদেশনীতির কয়েকটি কৌশলের বিস্তৃত বর্ণনা আমরা করলাম। উপসংহারে দু-একটি বিষয়ের অবতারণা করা দরকার। আধুনিককালের কোনো বৃহৎশক্তি একটিমাত্র কৌশল প্রয়োগ করে বিদেশনীতি প্রস্তুতের কথা ভাবে না। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্বপরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে বিদেশনীতিকে ফলদায়ক করে তুলতে হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে চলতে হবে। কূটনীতি আশানুরূপ ফলোৎপাদনে ব্যর্থ হলে বৈদেশিক সাহায্য, সামরিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়, তবে কোন্ পদ্ধতি কখন ও কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা একটি রাষ্ট্রের বিদেশদপ্তরে ধুরন্ধর আমলারা স্থির করেন। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী। ইংরেজিতে একটি কথা আছে carrot and stick এবং অনেক রাষ্ট্র এর সাহায্য নেয় বিদেশ-নীতির ক্ষেত্রে। প্রথমে রাষ্ট্র সম্মতকরণ উপায়ে একটি রাষ্ট্রকে তার সমর্থক রাষ্ট্রে পরিণত বা তার অনুগামী করে তোলার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেই কৌশল সফল না হলে হুমকি প্রদর্শন বা শাস্তিদানের পথ নেয়।

বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণের যুগে বিদেশনীতি এবং এর কৌশল একটু ভিন্নমাত্রা পেয়েছে বলে আমরা মনে করি। বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের শিল্পায়নে পুঁজি ও প্রযুক্তি সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার বিদেশনীতির কিছু কিছু লক্ষ্যকে সফল করে দেওয়ার চেষ্টা সন্তর্পণে চালিয়ে যাচ্ছে। এটি হল সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। জাপান সরকার এবং জাপানের

লগ্নিকারী সংস্থাগুলি এশিয়ার অনেক দেশে পুঁজি লগ্নি করছে এবং সেই দেশের প্রযুক্তি বাইরে সরবরাহ করছে। এককালে জাপান একটি সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক এবং যুদ্ধবাজ দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। আজ তার শিল্পায়ন এবং দরাজহাতে বিদেশকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসা বিদেশনীতির একটি কৌশলে পরিণত হয়েছে। এমনকি চিনের শিল্পায়নে জাপান লগ্নি করছে। সাতের দশকের আগে পর্যন্ত চিনের সঙ্গে আমেরিকার অহিনকুল সম্পর্ক ছিল। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ এসে সেই তিক্ততার কলেবর হ্রাস করে দিয়েছে।

অতীতে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে মতাদর্শ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করত। আজ মতাদর্শ অন্তর্হিত হয়নি ঠিকই তবে শিল্পায়নকে প্রতিটি উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্র এত বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে যে শিল্পায়নের প্রয়োজনে মতাদর্শের প্রতি আনুগত্যকে কিছু পরিমাণে শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশনীতি প্রস্তুতকালে রাষ্ট্র লক্ষ রাখছে তার জাতীয় বিকাশ কী পরিমাণে উৎসাহিত হবে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বিদেশনীতির কৌশল প্রয়োগকালে রাষ্ট্র অতীতের তুলনায় বেশি পরিমাণে সাবধানতা অবলম্বন করছে। যেমন আমরা জানি প্রোপাগান্ডা বা প্রচারণা বিদেশনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। কিন্তু রাষ্ট্র এই কৌশলটি নির্বিচারে প্রয়োগ করতে পারে না। জার্মানির একনায়ক হিটলার এবং তাঁর অনুচরগণ যেভাবে এটি প্রয়োগ করতেন আজ তার সুযোগ নেই। নাগরিক অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন ও রাজনীতিক- চেতনাসম্পন্ন। সুতরাং প্রোপাগান্ডার দ্বারা প্ররোচিত হয় না বা সর্বৈব মিথ্যা প্রচারকে মেনে নেয় না। একটি বক্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়ার আগে সচেতন ও শিক্ষিত নাগরিক বারংবার সেই বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করে নেয়।

বিশ্বের নানা জায়গায় নানা ধরনের আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে উঠছে এবং এরা বিদেশনীতির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ থেকে দূরে নেই। একটি সংগঠনের সদস্যরা যখন বিদেশনীতির জন্য যে কৌশল প্রয়োগ করে তখন লক্ষ রাখে ওই কৌশল যেন তার সংগঠনের অন্যান্য সদস্যের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতিকে ক্ষতি না করে বা সদস্যরাষ্ট্রের বিদেশনীতির পরিপন্থী না হয়। যেমন—ইউরোপীয় সংঘের কোনো সদস্য বিদেশনীতি প্রস্তুতের জন্য এমন কৌশল প্রয়োগ করবে না যা ওই সংঘের অন্যদের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং এখানে কৌশল বড়ো কথা নয় কৌশল প্রয়োগের সম্ভাব্যতা এবং সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সম্পর্ক হল আসল। একটি সংগঠনের সদস্যরা বিদেশনীতি তৈরির সময় লক্ষ রাখে ওই সংগঠনের নিয়মতন্ত্র বা বিধি যেন লঙ্ঘিত না হয়। সুতরাং কৌশল প্রয়োগের এটি হল একটি বড়োমাপের সীমাবদ্ধতা।

বিদেশনীতির কৌশল নির্ধারণ এবং তার প্রয়োগকালে একটি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য স্মরণ করতেই হবে। যেমন একটি রাষ্ট্র এমন বিদেশনীতি প্রস্তুত করবে না অথবা এমন কৌশল প্রয়োগে অগ্রসর হবে না যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বা অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ করে। আবার আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম মেনে চলার প্রশ্ন আছে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য হল বিদেশনীতির কৌশলটি বড়ো কথা নয়, প্রয়োগটি আসল। প্রতিটি রাষ্ট্রকে কৌশল প্রয়োগকালে পর্যাপ্ত দক্ষতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বিশ্বপরিস্থিতি এবং কৌশল প্রয়োগের সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করতে হয়।